ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ।। ২ মাঘ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৭ জানুয়ারি ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

নেতাই গণহত্যার পেছনে কারা?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৭ জানুয়ারি সকালে লালগড়ের (থানা থেকে তিনমাইল দূরে) নেতাই গ্রামে হার্মাদদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে দুজন মহিলাসহ মোট আটজনের মৃত্যু ও কুড়িজনের বেশি সাঙ্ঘাতিক জখমের খবর এখন সবার জানা। তবে এখানেই শেষ নয়, পেটে গুলি লেগে এখনও কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন। তবে যে রথীন দণ্ডপাটের বাড়িতে হার্মাদ শিবির

দীর্ঘদিন যাবৎ চলছিল সে কে? তার বাড়িতেই হার্মাদ শিবির কেন? কেন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হঠাৎ করে হার্মাদদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো— এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় থেকে পুলিশ-প্রশাসন ও সিপিএম এড়িয়ে গেলেও আসল ঘটনা পরম্পরা চেপে রাখা যায়নি।

রথীনের বাবা নরসিংহ দণ্ডপাট লালগড় হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর জমির পরিমাণ ছিল প্রায় একশ বিঘারও বেশি।

উনি ১৯৭৮ সালের প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনেই সিপিএম-এর টিকিটে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন লালগড় ৭নং অঞ্চল থেকে। পরপর কয়েকবার জেতেনও। অন্য অনেকের জমি বর্গা অথবা জবরদখল হলেও তাঁর এক ছটাক জমিতেও কেউ দাঁত ফোটাতে পারেনি। রক্ষাকর্তা অবশ্যই সিপিএম। পার্টির দৌলতে নিজের জামাইকেও লালগড় হাইস্কুলে ঢুকিয়ে দেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রও দক্ষিণ কলকাতার পশ্চিম পুঁটিয়ারীতে মূলত সুপারিশের জোরেই হাইস্কুলের শিক্ষক। তখনও স্কুল সার্ভিস কমিশন হয়নি। নরসিংহবাবু স্বর্গত হয়েছেন অনেকদিন, তবে আত্মীয় স্বজনদের পার্টির দৌলতে প্রতিষ্ঠিত করে যান বলেই এলাকার মানুষদের বিশ্বাস।

জনগণের কমিটি গঠিত হলে লালগড় এলাকার মানুষ ওইসব স্বজন ও ক্ষীর-সর খাইয়েদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তখন রথীন দণ্ডপাট বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। গত পুজোর সময় মেদিনীপুর থেকে-ধেড়ুয়া পর্যন্ত হার্মাদ ও যৌথবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে লালগড়ে প্রায় দেড় বছর বাদে দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অ-সি পি এম জনগণ এতে প্রমাদ গোণে। মেদিনীপুরের এনায়েতপুর থেকে ধরমপুর-ধেড়ুয়া-লালগড়ের আশপাশে নেতাই পর্যন্ত হার্মাদ শিবির গড়ে ওঠে। জোরজবরদস্তি করে

(এরপর ৪ পাতায়)

বিশ্ব সংস্কৃত বইমেলা

ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত বিশ্ব সংস্কৃত বই মেলার মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) কর্ণাটকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী বিশেশ্বর হেগড়ে, প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এন গোপালস্বামী এবং ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে।

সেকাল আর একালের দ্বন্দ্বে শাশ্বত নেতাজী-শ্যামাপ্রসাদ

অর্ণব নাগ।। 'কোন কাল বর্ণনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই কালের প্রধান প্রধান শ্রেণীর লোকের চিত্র প্রদর্শন করিয়া, সেই কালের লোকেরা সাধারণতঃ দৈনিক জীবন কিরূপে যাপন করিতেন ও জীবনের প্রধানকার্য্য—যথা, ধর্মসাধন, বিষয়কার্য্য সম্পাদন ও আমোদ সম্ভোগ— কি প্রকারে নির্বাহ করিতেন, তাহা বর্ণন করিলে সেই কালের প্রকৃত ছবি মনে প্রতিভাত হইতে পারে।''—রাজনারায়ণ বসু (সেকাল আর একাল)

আমন্ত্রণপত্রটা একঝলক দেখলে রীতিমতো ঘাবড়ে যেতে হয়। ৬ জানুয়ারি শীতকালীন সন্ধ্যায় ভবানীপুরের আশুতোষ কলেজস্থিত আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে যে বিতর্কসভার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে তার বিষয়— ''সভার মতে— নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যুবসমাজের কাছে আজও প্রাসঙ্গিক।'' একটু অবাক হতে হলো— এ নিয়ে কোনও সন্দেহ আছে না কি? ধাঁধাটা আরও বাড়ল সভার এই মতের 'বিপক্ষে' যাঁরা আছেন তাঁদের নামগুলো দেখে— যথা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নির্বেদ রায়, সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তিনি অনুপস্থিত থাকায় বাদশা আলম এসেছিলেন) ও শতরূপা। নেহাত কট্টর নেহরু ছাপওয়ালা কংগ্রেসী কিংবা সিপিএম ছাপওয়ালা বামপন্থী ছাড়া এই বিতর্কের বিপক্ষে কেউ যেতে পারেন বলে ভূ-ভারতে কেউ কখনও বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু উপরোক্ত নামগুলোর সঙ্গে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই তা জনসমক্ষে স্বীকৃত। পাশাপাশি এই বিতর্কের 'পক্ষে' থাকা নামগুলিও রীতিমতো হেভিওয়েট— অধ্যাপক তথাগত রায়, বর্তমান পত্রিকার সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক শ্যামলেশ দাস।

এই ধাঁধাটার আন্তরিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করলেন বিশিষ্ট নেতাজী গবেষিকা তথা এই বিতর্ক-সভার অন্যতম আয়োজক নেতাজী ভাবনা-মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ পূরবী রায়। ভাবনা-মঞ্চের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় তিনি জানালেন, এটা আদতে নেতাজী'র ভাবনারই ধারক। আর সেই ভাবনা'র কিছুটা আভাস দেওয়া ছিল আমন্ত্রণ পত্রেই—''বাংলার দুই কৃতি সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজও বীর

বিতর্কসভায় বক্তব্য রাখছেন ডঃ পূরবী রায়, উপস্থিত নির্বেদ রায় প্রমুখ।

আফসোস স্পষ্ট করেই প্রতীয়মান হচ্ছিল। আর স্রেফ এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ আজও কতটা প্রাসঙ্গিক— এরকম একটা দুরপনেয় প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করলেন তাঁরা। বাদশা আলম যেমন স্পষ্টই বললেন, আজকের মতো তখন এহেন সামাজিক, প্রাকৃতিক (যেমন বিশ্ব উষ্ণায়ণ) ও পরিবেশ সমস্যার মোকাবিলা সুপরিকল্পিত উপেক্ষার শিকার।'' প্রসঙ্গত, রাজশ্রী চৌধুরীর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ডেভলপমেন্টও ছিল এই বিতর্কসভার যৌথ উদ্যোক্তা।

বিতর্ক শুরু হতেই ধাঁধাটা ক্রমশ কেটে যেতে লাগলো। স্পষ্ট হতে লাগলো সেকাল আর একালের দ্বন্দ্ব। যাঁরা সভার মতের বিপক্ষে ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যে হলো'— গোছের একটা

হয়নি ওই দুই মহান মনীষী-কে। তাঁর প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা— নেতাজী-শ্যামাপ্রসাদ যুব-সমাজকে পথ-প্রদর্শনে তাঁদের ভূমিকাটা কতটা পালন করতে পেরেছেন? নইলে যুব-সমাজ আজ এতটা পথভ্রষ্ট হবেন কেন? এই জিজ্ঞাসা পুরোপুরি অবান্তর এমনই মত তথাগত রায়ের। এই দুই 'মহাপ্রাণ'কে বরঞ্চ তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য কারণ এঁরা দুজনেই স্রোতের

(এরপর ৪ পাতায়)

নন্দীগ্রামের পর নেতাইগ্রাম

সন্ত্রাস ছড়িয়ে ভোট করতে চায় সিপিএম

গূঢ়পুরুষ।। নন্দীগ্রামের পর নেতাইগ্রাম। সিপিএমের খুনের রাজনীতির বৃত্তটি আপন গতিতে শেষ পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নন্দীগ্রাম বাম শাসনের বিদায় ঘণ্টা বাজায়। কমরেডরা সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনেনি। শুনলে নেতাইগ্রামে রক্ত ঝরতো না। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই প্রায়ই বলেন, সিপিএম কর্মীদের বিনয়ী হতে হবে। অতীতের ভুল সংশোধন করতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সিপিএম কর্মীরা কোথাও ভুল স্বীকার করে আত্মসংশোধন

করেছে এমন আজব ঘটনা পশ্চিমবঙ্গবাসী শোনেননি। নন্দীগ্রাম ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল এই রাজ্যের মানুষ সিপিএমের লাল সন্ত্রাস আর বরদাস্ত করবে না। পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনে লাল পার্টির ভরাডুবি হওয়ার পরেও বধির কমরেডদের কানে নন্দীগ্রামের ঘণ্টাধ্বনি প্রবেশ করেনি। করলে আলিমুদ্দিনের নেতারা সদর্পে বলতেন না, বিধানসভার ভোটের আগে আমরা অল আউট যাবো। অর্থাৎ প্রয়োজনে লাল সন্ত্রাস ছড়িয়ে বাম বিরোধিতার শিকড় উপড়ে বিধানসভার নির্বাচন অষ্টমবার জিতব। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন ছাই না করুন, সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বের একটা বড় প্রভাবশালী অংশের আজও বিশ্বাস— লাল সন্ত্রাস বিধানসভা নির্বাচনে দলকে জেতাবে। তাই সুশান্ত ঘোষ,

(এরপর ৪ পাতায়)

রাজ্য রাজনীতি

‘হার্মাদ’ শব্দ নিয়ে বিতর্ক তুলে সন্ত্রাসের কথা গুলিয়ে দিল সিপিএম

নিশাকর সোম

এ-রাজ্যে নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এরই অঙ্গ হিসাবে অবশ্য বুদ্ধবাবুকে দেওয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম-এর চিঠিটাকে গণ্য করলে ভুল হবে। বার বার মমতার চাপ— যৌথবাহিনী-সিপিএম হার্মাদদের যৌথ সন্ত্রাস-এর কথা শুনতে শুনতে অবশেষে এই পত্রাঘাত। তাও আবার ডাকযোগে পাঠিয়ে, দু'দিনের বিলম্বে পৌঁছানো-তে আর এক 'নাটক'। চিদম্বরমের চিঠির ফল হলো— সাপও মরলো লাঠিও ভাঙল না। অর্থাৎ মমতা সন্তুষ্ট হলেন, তিনি চিদম্বরমের চিঠি নির্বাচনী প্রচারের হাতিয়ার করবেন। আর বুদ্ধবাবুরাও খুশি, কারণ এটা পত্রবোমা ৩৫৫-এর ইঙ্গিত— এটাই প্রচার করবেন বুদ্ধবাবুরা। বুদ্ধবাবুদের সুবিধা হলো আসল কথা এড়িয়ে খালি হার্মাদ শব্দটি নিয়েই সন্ত্রাস-এর কথা গুলিয়ে দেওয়া গেল। এই ঘটনাকে কেউ কেউ গট-আপ ম্যাচ বলছেন! এ প্রসঙ্গে যে কথাগুলি সামনে এসেছে তা'হলো কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব— মমতাকে 'অ্যানপ্রেডিক্টেবল অ্যালি' বলে মনে করেন। কারণ মমতা কেন্দ্রীয় সরকারে থেকেও যৌথবাহিনীর বিরোধিতা করেছেন। এমন বক্তৃতা করেছেন যাতে কেন্দ্রীয় সংসার সম্পর্কে তীব্র সমালোচনার সুর ছিল। যা' হোক, শেষমেশ মমতা নরম হয়েছেন।

তৃণমূল নেতারা দীপা দাসমুন্সি প্রমুখদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য কটুক্তি করেছেন। মমতার লক্ষ্য হলো এ-রাজ্যে কংগ্রেস-কে কাগুজে কংগ্রেসে পরিণত করা। শোনা যাচ্ছে, প্রদীপ ভট্টাচার্য, আবদুল মান্নান নাকি তৃণমূলে যেতে চান। শুধু একটা গ্যারান্টি চান। সেই গ্যারান্টি হলো বিধানসভার নির্বাচনে মনোনয়ন এবং পরবর্তীতে 'মন্ত্রী' করা। রাজ্য কংগ্রেস সঙ্গে না থাকলে ভোট কাটাকাটিতে সিপিএম-এর সুবিধা হবে— এটা মমতা জানেন। অপরদিকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস চাইছে যে কোনওরকম মান বাঁচানোর মতো সিটে জিতে মন্ত্রিসভায় ঢুকে ক্ষমতার ব্যবহার করে দলের বিস্তার সাধন। কংগ্রেস ক্ষমতায় না থাকলে এগোতে পারে না। মমতার

এটা স্পষ্ট যে সিপিএম নির্বাচনে জিতে এবারে আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে না। প্রথমত, ভোটারদের মধ্যে যে বিরাট সংখ্যক যুব ভোটার আছেন তাঁদের কাছে অতীতের ৭০—৭২-এর সন্ত্রাস দাগ কাটবে না। বরঞ্চ সদ্য সদ্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-জঙ্গলমহলে অনাহার, সিপিএম বিরোধী ভোটের পুঁজি হবে।

সাম্প্রতিক কয়েকটি উক্তি জনসাধারণের মধ্যে তাঁর কথাবার্তার সার সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে— (১) 'আমি খুন হলেও...' —এতে কি তিনি বোঝাতে চাইছেন যে তাঁকে খুন করার চক্রান্ত হচ্ছে? সিপিএম টালাট্যাঙ্কে বিষ মিশিয়ে দেবে— মমতার এই অভিযোগ ভয়ানক কথা। সিপিএমের অভিযোগ— জল সরবরাহে খামতি ঢাকতে জলের ব্যবহার সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি করার জন্যই মমতার এই চাল। এটা স্পষ্ট যে সিপিএম নির্বাচনে জিতে এবারে আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে না। প্রথমত, ভোটারদের মধ্যে যে বিরাট সংখ্যক যুব ভোটার আছেন তাঁদের কাছে অতীতের ৭০—৭২-এর সন্ত্রাস দাগ কাটবে না। বরঞ্চ সদ্য সদ্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-জঙ্গলমহলে অনাহার, সিপিএম বিরোধী ভোটের পুঁজি হবে।

দ্বিতীয়ত যে-ভাবে সিপিএম নেতারা নিচের তলার কর্মী-নেতা-জেলা কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছেন, তাতে মানুষ ভাবছেন আবার যদি এঁরা ক্ষমতায় আসেন, তবে তো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে! বিশেষ করে বিমান বসু দুর্গাপুরে বক্তৃতায় বলেছেন— ''কর্মী-নেতাদের শিং গজিয়েছে।'' লোকে ভাবতে পারেন ক্ষমতায় এলে শিং দিয়ে এঁরাই গোঁতাবেন না তো?

এইসব সমালোচনার একটা নেতিবাচক ফল সিপিএম নেতা-কর্মীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মনোভাব হলো— ''কাজের সময়ে কাজী— কাজ ফুরালেই পাজি।'' তাই তাঁরা বলছেন, ''কেত্তনের ধারে ধারে থাকবো— ঢোল বা কাঁসিদার হবো না।'' সিপিএম নেতাদের মনে রাখা দরকার— কর্মীদের এভাবে শুদ্ধ করে কাজে নামাতে পারা একান্তই কষ্টকর! নিচের তলার কর্মীরা বুদ্ধ-বিমান-বিনয়-নিরুপম-শ্যামল-এর সমালোচনায় সরব। তাঁরা বলছেন বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়ে প্রথমেই রতন টাটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আর ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট নিধনের সহযোগী সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি হলে বুদ্ধবাবু বলেছিলেন, ''আজ আমার সবথেকে আনন্দের দিন।'' নিচের তলার কর্মীদের শাসিয়ে কাজে নামানো যাবে না। পরন্তু নেতারা মাইনে চেয়ে কাজে নামার কথা বললে তবেই কিছু (সকলে নয়) কর্মী কাজে নামবেন। কলকাতায় তো বেশ কয়েকটি লোকাল কমিটি দলাদলি করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। নেতারা শুধু পার্টি অফিসে বসে খোয়াব দেখেন কংগ্রেস তৃণমূলের দ্বন্দ্বে পার্টির কতটা লাভ হবে।

এছাড়া বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাড়তি সিট দাবি করছে। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করে ফরওয়ার্ড ব্লক-কে একটা সিট কমাবার ব্যবস্থায় রাজি করিয়েছিলেন বিমান বসু। এখন জেলা নেতৃত্বের চাপে অশোক ঘোষ বেশি সিট দাবি করছেন। সিপিএম-সিপিআই-কে বেশি একটি সিট দিতে রাজি হয়েছে। আর এস পি-ও বেশি সিট দাবি করছে। তবে শেষমেশ বামফ্রন্টে সিটের দ্বন্দ্ব মিটে যাবে। কিন্তু সিপিএম-এর মধ্যেই কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণায় প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে তীব্র মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে। রাজদেও গোয়ালা কি মনোনয়ন পাবেন? কেননা তাঁর বিরুদ্ধে জেলা-নেতৃত্বের একাংশ বাধা দিচ্ছেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গোপন কথাটি

ইংরাজি নতুন বছর শুরু হইয়া গিয়াছে। বছর শুরুর কামনা থাকে সকলে যেন সুখে শান্তিতে থাকিতে পারে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় তরিতরকারির আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে হইয়াছে তাহাতে দেশের মানুষ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে আজ অভিযুক্ত করিতেছেন। অপরদিকে দুর্নীতির মিছিলে দেশ ভারাক্রান্ত। দুর্নীতির বোঝা মাথায় লইয়া দায়িত্ব ছাড়িতে হইয়াছে এক মুখ্যমন্ত্রী ও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। এ এক আশ্চর্য সময়। বিশ্ব অর্থনীতির জগতে প্রবল শক্তি হিসাবে একদিকে যখন ভারত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ঠিক তখনই একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারির খবর সামনে আসিতেছে। চাকচিক্যময় কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হইবার পরে পরেই গেমস সংক্রান্ত দুর্নীতির খবর একের পর এক প্রকাশিত হইয়াছে। স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি ভারতীয় রাজনীতিতে যে পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহা প্রায় বোফর্স কেলেঙ্কারির সঙ্গে তুলনীয়। যদিও হালফিলের টু জি স্পেকট্রাম বা কমনওয়েলথ গেমসের তলায় ধামাচাপা পড়িয়া গিয়াছিল বোফর্স মামলা। সাম্প্রতিক নানা ঘটনার বিতর্কের ভিড়ে বোফর্সকে ধামাচাপা দেওয়ার কৌশলও করিয়াছিল কংগ্রেস। কিন্তু সত্য একদিন না একদিন প্রকাশিত হইয়াই থাকে। কংগ্রেস দল ও তাহার সরকার ভালোভাবেই জানেন বোফর্স ঘুষ কেলেঙ্কারিতে ইতালির ব্যবসায়ী কাত্রোচ্চির জড়িত থাকার কথা। কাত্রোচ্চির সহিত তাহার ভারতীয় বন্ধু ও ইতালীয় সহেলী যে এই কলঙ্কে জড়িত তাহা যাহাতে ভারতবর্ষের মানুষ কোনওকালে কোনওভাবেই জানিতে না পারেন তাহা নিশ্চিত করিতে মনমোহনের কংগ্রেস সরকার সিবিআইকে অপব্যবহার করিয়া সুনিশ্চিত করিয়াছে যে, কাত্রোচ্চি এই দেশ ছাড়িয়া যাহাতে পলায়ন করিতে পারে। আজ বোফর্স লইয়া গোপন তথ্য ফাঁস হইয়াছে। স্বচ্ছতার প্রতিভূ নিষ্কলঙ্ক প্রধানমন্ত্রী এত কাণ্ডের পরও কতকাল নিজের ঢোল নিজেই বাজাইবেন তাহা তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে। কেননা সরকারের সাফল্যের দায় যদি প্রধানমন্ত্রীর উপরই বর্তায়, তাহা হইলে সরকারের নানা দুর্নীতির দায়দায়িত্বও শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর উপর বর্তাইতে বাধ্য। কংগ্রেসী বাজনদাররা যতই বড় মুখ করিয়া বলুন না কেন, ব্যক্তিগত ভাবে প্রধানমন্ত্রী নিষ্কলঙ্ক, তাহা আর দেশের মানুষ বিশ্বাস করেন না। সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যখন স্পেকট্রাম ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে হলফনামা পেশ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন তখন আর ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করার প্রশ্নও থাকিতে পারে কি? আসলে দুর্নীতির ট্র্যাডিশন জওহরলাল হইতে ইন্দিরা গান্ধী হইয়া সোনিয়ার রাজ্যপাটেও একইভাবে চলিতেছে। ভবিষ্যতেও চলিবে কারণ অনেক কিছুর মতো ইহাও কংগ্রেসের একটি ঐতিহ্যগত পরম্পরা।

সরকারের গায়ে ক্রমাগত কলঙ্কের দাগ লাগিবার ফলে সরকারের ভাবমূর্তি যখন শূন্যতায় পর্যবসিত তখন সেই দাগ মুছিতে সরকার ও কংগ্রেস দল যে প্রচেষ্টা লইয়াছে তাহা দেশের মানুষের কাছে আরও কলঙ্কিত বিষয়। দুর্নীতি দমন করিবার বদলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতির কলঙ্কগুলি চাপা দিবার জন্য হিন্দু সন্ত্রাসবাদের গল্প বাজারে আমদানি করিতেছেন। কিন্তু এবিষয়েও গোপন কথাটি বারবার ফাঁস হইয়া যাইতেছে। এখন তো সরকারিভাবেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে মুসলিম তোষণ করিয়া কেবল মুসলিম ভোট আদায়ের জন্যই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বারবার হয়রান করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস দল। এখন আর এস এসের গায়ে সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগাইবার জন্য বাজারে নাটক চলিতেছে। সিবিআই সহ নানা সরকারি সংস্থাকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার প্রচেষ্টা তাহারই অঙ্গমাত্র। সেজন্য এই সংস্থাগুলিতে ধামাধরা অযোগ্য ব্যক্তিদের বসানো হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভিজিল্যান্স কমিশনার পদটি লইয়া যে কেচ্ছা ধরা পড়িয়াছে তাহা আজ সকলেই অবহিত। অতি সম্প্রতি কম্প্রট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটার জেনারেলের (ক্যাগ) রিপোর্ট লইয়া মন্ত্রী কপিল সিবালের মন্তব্য লক্ষণীয়। আসলে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই কংগ্রেস দল এখন সমস্যায়। একদিকে অবিশ্বাস্য হারে নাকি ঘটিয়া চলিয়াছে আর্থিক প্রগতি, অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর দাম এমনভাবে পড়িয়াছে যে তাহাতে আম-আদমির অবস্থা কাহিল। নিত্যনতুন দুর্নীতির খবর বাজারে চাউড় হইবার ফলে হিন্দুসন্ত্রাস নামক সার্কাসের রিং এ খেলা দেখানো ছাড়া কংগ্রেসের আর অন্য কোনও উপায়ও নাই—যোগ্যতাও নেই। পাকিস্তানের পেটেন্ট অ্যাজেন্ডা প্রচারের ভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়া ভারতবর্ষের মানুষকে আর কত অপমান করিবেন তাঁরা? কিছুদিন আগে রাহুল গান্ধী যে সিমি-র সঙ্গে আর এস এসের তুলনা করিয়াছেন, তাহা এই গোপন অ্যাজেণ্ডারই অঙ্গ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়। সকল দুঃখ সকল পাপের মূল অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রী ভাবনাতেই এই অহংভাবে লুপ্ত হয়—এই সত্যটিই আত্মার আলোক। এই আলোক দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটি হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তি মন্ত্রের ভারতবর্ষ—সেই এই তপস্বীর ভারতবর্ষে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রযুদ্ধের রাজনীতি

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে চিঠি বিনিময় নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দুটো চিঠি এসেছে, মাঝখানে গেছে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ও চিঠি বিনিময় হতেই পারে। কিন্তু চিঠি বিনিময়ের পটভূমি এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরটা জাতীয় রাজনীতিকে বেশ জটিল করে তুলেছে।

এই ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম চিঠিটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসার আগেই সেটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে গেছে— এটা সত্যিই এক রহস্যময় ব্যাপার। জানা গেছে— স্পীড্‌পোষ্টে চিঠিটা এসেছে ২৫ ডিসেম্বর ও ২৬ তারিখ ছিল 'রেস্‌ট্রিক্‌টেড' ছুটি, ২৭ তারিখে সেটা এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে। এই কারণে সংশ্লিষ্ট সাতজনকে 'শোকজ' করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছয় জনই মার্ক্সবাদীদের সংগঠনের লোক। তার ফলে ইউনিয়ান কর্মবিরতি পালন করেছে এবং দণ্ডাজ্ঞা বাতিলের দাবি তুলেছে।

প্রশ্ন হলো— চিঠিটা ফাঁস হলো কেমন করে? পূর্বোক্ত চিঠির বয়ান সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল— তাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লেটারহেড্‌ ও স্বাক্ষর ছিল না। তাহলে কি এটা ফাঁস হয়েছে দিল্লিতেই? নাকি এটা এখানকার ইউনিয়ান-কর্মীদেরই কীর্তি?

ব্যাপারটা কিন্তু খুঁজে দেখার মতো। এত সহজে এটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো জিনিস নয়।

দ্বিতীয়ত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠিতে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে—

● তিনি জানিয়েছেন, জঙ্গলমহলে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথবাহিনী কাজ করে চলেছে, কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে সি পি আই (এম)-এর সশস্ত্র বাহিনীও। তাঁর প্রশ্ন— যদি মাওবাদীদের দলের জন্য যৌথবাহিনী কর্মরত থাকে, তাহলে ক্যাডারদের নামানো হলো কেন?

● তাঁর মতে, সেখানে ওই দলের বহু কর্মী ও নেতা কর্মরত আছে, তাদের হাতে আছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। রাজ্যের উচিত সেই অস্ত্র উদ্ধার করা এবং ওই অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

● সিপিআই(এম)-এর ক্যাডারদের তিনি 'হার্মাদবাহিনী' বলে উল্লেখ করেছেন।

● তিনি আরও জানিয়েছেন, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— কিন্তু এখনও কিছু জায়গায় সমস্যাটা রয়ে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন ব্যঙ্গাত্মক ভাবে। তিনি শুরু করেছেন এভাবে— 'Kindly refer to your secret letter published in the media before it reached my office।' চিঠিটা গোপন— অথচ সেটা আগেই সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছে, এই নিয়ে তিনি একটা খোঁচা দিতে চেয়েছেন একেবারে প্রথমেই।

তাঁর বক্তব্য হলো—

● গণ্ডগোলের অনেকটা দায়িত্ব তৃণমূল কংগ্রেসের। মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই দল অরাজকতা বজায় রাখছে।

● এই দল প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না;এবং

● 'হার্মাদ' শব্দটা ব্যবহার করা উচিত হয়নি— এটা 'nasty'। মনে হয়, তৃণমূলের দ্বারাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভাবিত হয়েছেন।

এরপরে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একই সঙ্গে ডাকযোগে ও ফ্যাক্স করে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। তাছাড়া এবার পাঠিয়েছেন দুটো চিঠি— একটাতে তাঁকে তিনি আলোচনার জন্য দিল্লিতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর দ্বিতীয় চিঠিতে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে তাঁর জবাবী বক্তব্য।

দেড় বছর ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মাওবাদীদের হটানোর কাজ চলছে। গত তেত্রিশ বছরের বাম-শাসনে এখানকার কোনও উন্নয়নই হয়নি— এবারের এই টাকাটা বরং সেই কাজে লাগালে মাওবাদীদের ঘাঁটিটাই থাকত না।

তিনি জানিয়েছেন—

● কোনও মনগড়া তথ্য তিনি জানাননি। তাঁর দেওয়া তথ্য এসেছে সি আর পি এফ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট থেকেই। অর্থাৎ নিজস্ব সূত্র থেকেই তিনি ক্যাডারদের বিশ্রী ভূমিকার কথাটা জেনেছেন।

● কোনও রাজনৈতিক দলের দ্বারা তিনি আদৌ প্রভাবিত হননি। তিনি তুলেছেন বাস্তব সমস্যার কথা।

● জঙ্গলমহল এবং আরও বহু জায়গায় সি পি আই (এম) দলের সশস্ত্র শিবির আছে— এটা তথ্য-সমর্থিত সত্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও শান্তি নিশ্চিত করার জন্য এটা বাঞ্ছনীয় নয়। সেই জন্যই রাজ্য-সরকারের উচিত এই ব্যাপারে যথাকর্তব্য পালন করা।

● 'হার্মাদ' শব্দটা তিনি ব্যবহার করেছেন সশস্ত্র কমরেডদের প্রসঙ্গে। তাঁর মতে, ঠিক প্রতিশব্দটা তিনি খুঁজে পাননি— মুখ্যমন্ত্রী সেটা দিতে পারলে তিনি সেটাই ব্যবহার করবেন (মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কিন্তু সেটা দিতে পারেননি)।

কিন্তু তাঁর চিঠির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো— মুখ্যমন্ত্রী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সশস্ত্র শিবির ভেঙেছেন কিনা এবং সশস্ত্র ক্যাডাররা সক্রিয় থাকলে কেন্দ্র থেকে রক্ষীবাহিনী পাঠানোর দরকার কি? মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সন্তর্পণে এই দুটো বিষয় এড়িয়ে গেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, 'The question that remains unswered in your letter, is it armed cadres continue to take upon themselves the duties of maintaining law and orders what is the role of the security-forces·'

মুখ্যমন্ত্রীকে একটা বড়সড় ধাক্কা দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন— খুঁটিনাটি ছেড়ে দিয়ে দরকার আসল বিষয়টা নিয়ে কথা বলা— 'Both of us should focus on the subject of my letter and not to distracted by extra-neous matters।' তাঁর আসল প্রশ্নের জবাব কই?

এমন মোক্ষম প্রশ্ন কোনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কখনও কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে করেছেন বলে জানি না।

তৃতীয়ত, কিন্তু আমাদের বক্তব্যও এই ধরনের।

মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল ও মাওবাদীদের সংযোগের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি এর কোনও অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন কি? একটা ভাঙা, পুরনো রেকর্ড বাজালেই হয় না— তথ্যপ্রমাণ হাজির করতে হয়। তাঁদের বিরোধিতা করলেই সমালোচকরা মাওবাদীদের পরম শ্রদ্ধেয়া মহাশ্বেতা দেবীকেও তো মাওবাদী বলে নিন্দিত করেছেন। তাহলে তো মানবতাবাদী মাত্রই মাওবাদী!

মমতা ব্যানার্জী শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন— সেই আন্দোলনের পেছনে কিছু মাওবাদীও আছেন নিশ্চয়— তাতেই একটা যোগসাজস প্রমাণিত হয়?

তিনি জঙ্গলমহলে যৌথ-বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন, তার ব্যাখ্যাটা অন্য ধরনের। মাওবাদী দমনের নামে যৌথবাহিনী ওই এলাকাকে মুক্ত করছে, আর সেই সুযোগে ক্যাডাররা সেটা দখল করছে। তাঁর আপত্তিটা এখানেই। এটা লক্ষণীয় যে, বহু নামী-নেতা বারবার ঘোষণা করেছিলেন—নভেম্বর-ডিসেম্বরেই এলাকাটা তাঁদের হাতে আসবে। দু'বছর পর তাঁরা সেখানে মিটিং করছেন। এটা কিসের ইঙ্গিত?

তাঁরা মাওবাদীদের নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল— রাজনৈতিকভাবেই তাদের মোকাবিলা করা হবে। তাহলে এখন যৌথবাহিনীর আড়ালে এলাকা দখলের কৌশল নিতে হলো কেন?

দেড় বছর ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মাওবাদীদের হটানোর কাজ চলছে। গত তেত্রিশ বছরের বাম-শাসনে এখানকার কোনও উন্নয়নই হয়নি— এবারের এই টাকাটা বরং সেই কাজে লাগালে মাওবাদীদের ঘাঁটিটাই থাকত না। মানুষ সাপ, ব্যাঙ, ডুমুর গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে আছেন কেন? কেন হাসপাতাল, বড় স্কুল-কলেজ, হেল্‌থ সেন্টার, বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়নি? কেনই বা কৃষির ব্যবস্থা ও কুটীর শিল্প গড়ে ওঠেনি? দেড় বছরেও কেন যৌথবাহিনী সফল হয়নি— সেটা বড় বড় খাসক

(এরপর ৪ পাতায়)

নেতাজী-শ্যামাপ্রসাদ

(১ পাতার পর)

বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার সাহস দেখিয়েছিলেন বলে। সভার বিপক্ষবাদীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে নেতাজীর আকস্মিক অন্তর্ধান কিংবা শ্যামাপ্রসাদের বলিদানের কতটা মূল্য দিয়েছি আমরা, যে আজ প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন তুলবো? অশ্রুসজল বিতর্কসভা স্রেফ আবেগমথিত হওয়া ছাড়া বাকিটা নিরুত্তরই ছিল।

এই বিতর্কসভা কিন্তু আরও একটা জিনিস নিঃশব্দে করে দিয়ে গেল। যার জন্য এর আয়োজক ডঃ পূরবী রায়-কে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। যাঁরা এতদিন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে একটা সামান্য গন্ডগোল নিয়ে নেতাজী সুভাষ আর ভারত-কেশরী শ্যামাপ্রসাদের দ্বন্দ্বকে প্রকটিত করে আসতেন, তাঁদের অজ্ঞতাকেই প্রকটিত করে বিতর্কসভার অন্যতম বক্তা শ্যামলেশ দাস নেতাজী আর শ্যামাপ্রসাদের দেশপ্রেমের লম্বা খতিয়ান পেশ করলেন। এর পাশাপাশি তথাগত রায় এঁদের পারিবারিক কিছু খুঁটিনাটি তুলে ধরলেন, যেমন— উভয়েরই বাড়ি ভবানীপুরে, দু'জনেরই অগাধ পৈতৃক সম্পত্তি এবং উভয়েরই বিড়ম্বিত বিবাহিত জীবন (শ্যামাপ্রসাদের স্ত্রী না হয় অল্পবয়সে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু যতদূর জানি নেতাজী'র বিবাহ-সম্পর্কিত মামলা এখনও আদালতের বিচারাধীন। এবং এই বিবাহের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুয়ো ও একে 'রাজনৈতিক চক্রান্ত' বলেই যেখানে অধিকাংশ নেতাজী গবেষকের মত, সেখানে স্রেফ লিওনার্দ গর্ডনের বইয়ের ওপর ভিত্তি করে তথাগতবাবু আদালতের বিচারাধীন এমন স্পর্শকাতর বিষয়টাকে স্রেফ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তুলনা টানার জন্যই টেনে আনলেন কিনা বোঝা গেল না)। এর সঙ্গে এঁদের কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মিল যেমন দু'জনেরই ভারতীয় দর্শনের প্রতি আস্থা, মৃত্যু রহস্য ইত্যাদি প্রসঙ্গও উঠলো। ফলতঃ গোটা সভাই একমত হলো যে দেশপ্রেমের মুদ্রার একপিঠে নেতাজী, অপর পিঠে শ্যামাপ্রসাদ।

কেবল নির্বেদ রায় সভার মতের বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একটি মূল্যবান প্রাসঙ্গিক তথ্যের অবতারণা করলেন যে— এঁদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ এখনও অবধি নেই। আর সেখানেই যথার্থ মুশকিল প্রাসঙ্গিকতার। নির্বেদবাবুর সুপরামর্শ— বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সেনেট সদস্য কিংবা শিক্ষা-নীতি নিয়ে বাবা (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়)-র সহায়ক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-কে নিয়ে গবেষণা করার প্রস্তাব; ভবিষ্যতে ভারত-কেশরীকে চটি বই বা প্যামফ্লেটের বাইরে বের করতে গবেষকদের সাহায্য করবে নিশ্চয়ই।

এই বিতর্কসভা মহাগুরুত্বপূর্ণ আরও একটা কারণে। কারণ তা ভারত-কেশরীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগকারীদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ আদৌ সত্যি কি না— তা যাচাইয়ের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন নির্বেদ রায়। কিন্তু সভার গোড়াতেই শ্যামলেশবাবু ও পরে সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত ফজলুল হক - শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ-কারীদের ডাহা মিথ্যেবাজ প্রমাণ করে দিলেন। সেনগুপ্তমশাইয়ের মতামতটাই যেন শেষপর্যন্ত প্রতিফলিত হলো সভার রায়ে— 'এই বিতর্কসভা অহেতুক। একধরনের মুর্খামি। নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ তাঁদের কর্মে, জীবনে প্রাসঙ্গিক ছিলেন, আজও সমানভাবে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।' শতরূপা যুবসমাজের কাছে শ্যামাপ্রসাদকে সঠিকভাবে না পৌঁছোনোর জন্য কংগ্রেসী চক্রান্তকেই দায়ী করেন।

নেতাজী আর শ্যামাপ্রসাদের কর্মযজ্ঞে যেমন মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রচুর অমিল, যার উল্লেখও তথাগত রায় করেছেন। বক্তা থেকে শ্রোতা সকলেই মেনে নিয়েছেন মিল-অমিল নিয়েও নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ আদতে ভারতমায়েরই দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান। বিতর্কটা উঠেছে কেবল এঁরা দু'জনে কালের গন্ডী টপকাতে পেরেছেন কিনা তা নিয়ে। সভা এও জানিয়ে নিয়েছে, সেকাল আর একালের দ্বন্দ্বে এই দুই মনীষী'র মনীষা শাশ্বতকালেই ঠাঁই করে নিয়েছে।

শোক-সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পলাশী শাখার স্বয়ংসেবক নদীয়া জেলার সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ উৎপল গুপ্ত-র মাতৃদেবী তৃপ্তিকণা গুপ্ত গত ৩ জানুয়ারি শেষ রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তিন পুত্র, পাঁচ কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

* * *

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাগরদিঘী ব্লকের সভাপতি মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য সঙ্ঘ ও বিবিধ ক্ষেত্রের দায়িত্বে আছেন।

* * *

গত ২১ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের সভানেত্রী ভারতী চট্টোপাধ্যায় ৬০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি বহুদিন ধরেই দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর ২ কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনি বর্তমান। তাঁর স্বামী প্রয়াত দেবদাস চট্টোপাধ্যায়ও সেনাবাহিনীতে ছিলেন।

* * *

গত ২৪ ডিসেম্বর সকালে বীরভূম জেলার বিশ্বহিন্দু পরিষদের সভাপতি শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী রেখা মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। পুত্র-পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেলেন তিনি।

জনজাগরণ অভিযানে নামছে আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এদেশের হিন্দুদের কলঙ্কিত করার জন্য সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশব্যাপী জনজাগরণ অভিযান শুরু করছে। এই অভিযানে রামজন্মভূমি ও কাশ্মীর ইস্যুটিকেও তুলে ধরা হবে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ মনমোহন বৈদ্য। আর এস এস এই তিনটি বিষয় নিয়ে পুস্তিকা, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ করবে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে তা প্রচার করবে। পশ্চিমবঙ্গে এই গৃহ সম্পর্ক অভিযান আগামী ১২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে বলে জানানো হয়েছে। শ্রী বৈদ্য আরও বলেছেন, আর এস এস হিংসায় বিশ্বাস করে না। সমাজ ও জাতির জন্য সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে।

সন্ত্রাস ছড়িয়ে ভোট

(১ পাতার পর)

দীপক সরকার, অনিল বসুরা পার্টিতে দাপটের সঙ্গে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন।

বিমান বসু, বুদ্ধ ভট্টাচার্যরা বিশ্বাস করেন যে এরাই বিধানসভার নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের জেতাবে। তাঁরা দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেন না। নন্দীগ্রাম লাল পার্টির কফিনে প্রথম পেরেকটিতে হাতুড়ি মেরেছিল। জঙ্গলমহলের নেতাইগ্রাম সেই কফিনের শেষ পেরেকটিতে হাতুড়ি মারলো। এই হাতুড়ির আঘাতেই এবার বিধানসভার নির্বাচনে 'কাস্তে-হাতুড়ি-তারা' বাংলা ছাড়া হবে তাতে এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলার নিরস্ত্র নির্যাতীত নিরন্ন মানুষ নিশ্চিতভাবেই কমরেডদের বুজিয়ে দেবে যে গণতন্ত্রে বুলেটের চেয়ে ব্যালটের শক্তি বেশি। বাংলার মানুষ দলতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র চায়।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে রাজ্যজুড়ে খুন জখমের রাজনীতি ততই শিকড় ছড়াবে। কারণ, কম্যুনিস্টরা আজও বিশ্বাস করে যে ক্ষমতার আসল উৎস বন্দুক। বামপন্থায় গণতন্ত্র, নির্বাচন ইত্যাদির কোনও স্থান নেই। ভারতের কম্যুনিস্টরা নির্বাচনে যোগ দিয়েছে তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসে নয়। ক্ষমতা দখলের একটি কৌশল হিসাবে। এই কৌশল নীতি বলে যে একবার ক্ষমতা হাতে পেলে সেই ক্ষমতা হারানো চলবে না। প্রয়োজনে রক্ত ঝরিয়েও সেই ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে। লোকসভার নির্বাচনের আগে রাজ্যের সিপিএম নেতৃত্ব ভাবেননি যে ভোটে এমন ভরাডুবি হবে। পার্টির জেলা নেতৃত্ব ভোটের আগে যে দলীয় সমীক্ষা রিপোর্ট পাঠিয়েছিল তাতেও এমন সঙ্কেত ছিল না। এবার দল আটঘাট বেঁধেই বিধানসভার নির্বাচনে নামছে।

রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই দলের জনসমর্থনে ভাটার টান চলছে তা অজানা নেই আলিমুদ্দিনের ম্যানেজারদের। তাই অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ ভোট এবার হতে দেবে না সিপিএম নেতৃত্ব। সন্ত্রাস ছড়িয়ে বিরোধীদের হঠিয়ে দিয়ে ভোট করতে চাইবে। বিশেষত তাদের হাতেই যখন পুলিশ প্রশাসন সবই আছে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ জানেন এই রাজ্যে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা সিপিএম নেতাদের দাসানুদাস। তা না হলে পশ্চিম মেদিনীপুরের আই পি এস পুলিশ সুপার রিপোর্ট দেন যে নেতাইগ্রামে গুলি চালিয়ে মানুষ খুন করেছে মাওবাদীরা। সিপিএম ক্যাডাররা নয়। এত বড় মিথ্যা কথা আলিমুদ্দিনের নেতারাও বলতে পারেননি। সেই অবিশ্বাস্য কথাটি লিখিতভাবে জানিয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার। একেই বলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। পদোন্নতি, অতিরিক্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির জন্য পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসননিক কর্তারা না পারেন এমন কাজ নেই।

একদা পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে লাল সন্ত্রাসের মাধ্যমে হারানো জমি উদ্ধারে সিপিএম 'সূর্যোদয়' ঘটাতে চেয়েছিল। পারেনি। সেই ঘটনা থেকে দল যে কোনও শিক্ষা নেইনি তার প্রমাণ নেতাইগ্রামের গণহত্যা। হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী সিপিএম নেতারা দেওয়ালের লিখন পড়তে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাঁরা বুঝেও বুঝছেন না যে নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় হয়নি। তবে নেতাইগ্রামে মানুষের রক্তের রঙ ৩৫ বছরের টানা ক্ষমতার সূর্যাস্তেরই প্রতীক। ক্ষমতান্তের আলোর রক্তিম আভা। হ্যাঁ, নেতাইগ্রামের গণহত্যা নিশ্চিতভাবেই সিপিএমের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়েছে।

নেতাই গণহত্যা

(১ পাতার পর)

সাধারণ যুবক কিশোরদের হার্মাদদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। গত অক্টোবর মাসে চন্দ্রকোণা রোডের নিকটবর্তী এক গ্রামের জনৈক যুবক সঙ্ঘর্ষে মারাও যায় বলে খবর।

এই সব হার্মাদ শিবিরের দেখভাল ও ব্যবস্থা স্থানীয় কমরেডদের নিয়ে ধরমপুরের অনুজ পাণ্ডে, ডালিম পাণ্ডে এবং লালগড়ের জয়দেব গিরি ও বেলাটিকরির চণ্ডী করণ করতেন বলেই খবর।

সংবাদ মাধ্যমের সূত্রেই জানা গিয়েছে, সম্প্রতি রাজ্যের শীর্ষ স্তরের অফিসাররা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে অফিসাররা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান— হার্মাদদের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। দুর্ঘটনা ঘটবে। তখন বুদ্ধ বাবু নাকি তাদের বলেন— আমি চিদাম্বরমের সঙ্গে কথা বলেছি। ম্যানেজ করে নেব। এক্ষেত্রে চিদাম্বরমের বুদ্ধ বাবুকে তলব করাটা 'গট-আপ' বলেই মনে হয়। কেননা, বুদ্ধ বাবু যে দিল্লীতে যাবেন না সেটা আগেই স্থির হয়ে থাকতে পারে। এখন দেখার, কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার এই 'গট-আপ' গেম'-কে কিভাবে ম্যানেজ করে?

পত্রযুদ্ধের রাজনীতি

(৩ পাতার পর)

নেতাদের মাথায় ঢুকেছে? ঘরে ঘরে কি মাওবাদী জন্মেছে? মুখ্যমন্ত্রী হার্মাদ শব্দটা নিয়ে গোঁসা করেছেন। কথাটা এসেছে পর্তুগীজ জলদস্যুদের বোঝানোর জন্য। কিন্তু তাঁর ক্যাডারদের কি বলতে হবে? 'সেবাব্রতী দল'? 'সন্ন্যাসী-সেনাবাহিনী'? 'ধর্মীয় উদ্ধারবাহিনী'? যে মোটরবাইক বাহিনী কেশপুরে অভিযান চালাত, বিজন সেতুতে যারা তাণ্ডব চালিয়েছে, সাঁইবাড়িতে যারা নারকীয় কাণ্ড ঘটিয়েছে, বানতলায় অনীতা দেওয়ানকে বর্বরভাবে হত্যা করে পাটভাঙ্গা ব্লাউজ শাড়ি পরিয়ে শুইয়ে রেখেছে, ছোট-আঙারিয়ায় গণহত্যা করে লাশ লুকিয়েছে, মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের মেরে, পুড়িয়ে এবং জলে বিষ মিশিয়ে ও বাঘ-কুমীরের মুখে ঠেলে দিয়ে এলাকাছাড়া করেছে, সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে ধর্ষণ ও হত্যা করে ব্যর্থ প্রেমিকা সাজিয়েছে, নন্দীগ্রামে চটি পরে পুলিশের সঙ্গে মিশে হত্যা-যজ্ঞ করেছে, সশস্ত্র অবস্থায় জননী ইটভাঁটায় ধরা পড়েছে এবং প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের হেনস্থা করেছে ও সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভেঙেছে, তাদের 'হার্মাদ' বলা যাবে না? তারা অহিংসা ভিক্ষুর দল? ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী? এদের তো বটেই, এদের মাথার ওপরের বিরাট নেতাদেরও কি আশ্রয়স্থল হওয়ার কথা ছিল না জেলখানা? অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী ও বাম-নেতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি পেয়ে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন— তাঁদের কাছে এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের অনধিকার হস্তক্ষেপ।

আইন-শৃঙ্খলা অবশ্যই রাজ্যের ব্যাপার। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজ্যের একটা স্বাধিকার আছে।

কিন্তু উক্ত নেতাদের ধারণা— পশ্চিমবঙ্গ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু সেটা ভুল— এটা ভারত রাষ্ট্রের একটা অঙ্গরাজ্য মাত্র। সুতরাং রাজ্যকে সেটা মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে। আমাদের সংবিধান অনুসারে রাজ্য সরকারকে বহু ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের পরামর্শ ও নির্দেশ মেনে চলতে হয়— এক্ষেত্রে তাঁদের গোঁসা না করে পার্লামেন্টের দুই কক্ষে ব্যাপক গরিষ্ঠতা নিয়ে এবং অন্তত অর্ধেক রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে সংবিধান সংশোধন করতে হবে (৩৬১ নং অনুচ্ছেদ)। ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন— এই সব কারণে ভারতীয় সংবিধানকে কিছুটা কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা বলা যায়—'The framers of the Indian constitution have deliberately provided for a centralised federation –' (ইন্ডিয়া ঃ ডেমোক্র্যাটিক গভর্ণমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ২৮৫)।

এটা লক্ষণীয় যে, আর্থিক প্রশাসনিক ও আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে কেন্দ্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যাপারেই দুটো বিশেষ অনুচ্ছেদ আছে। ২৫৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— প্রশাসনিক ব্যাপারে কেন্দ্র রাজ্যকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে। ডঃ বি সি রাউতের মতে, 'This is an obligation imposed on the executive power of the state'— (ডেমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৭৪)। আর ২৫৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই নির্দেশ পালন করতেই হবে। ডঃ সুভাষ কাশ্যপের মতে, সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য এটা দরকার ছিল—'to achieve a smooth working relationship between two levels'—(আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃঃ ২২৬)। এই প্রসঙ্গে ডঃ পাইলীর বক্তব্য হলো— রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল— বিভেদের মধ্যে ঐক্য ('unity in diversity') প্রতিষ্ঠা করা— (অ্যান্ ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ইনস্টিটিউশন, পৃঃ ২২৪)। এই সব কারণে দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন— সম্পর্কটা বেশ জটিল 'complicated'—(ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ২৭১)। তবে কেন্দ্রের নির্দেশ ও তদারকি মানতেই হবে। বিশেষ করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কেন্দ্র রাজ্যকে তার বাহিনী দিয়ে সাহায্য করছে— কিন্তু সেই সুযোগে রাজ্য-সরকার তার এলাকা-বিস্তার, ক্যাডার পোষণ, আশ্রয় শিবিরে অস্ত্র মজুদ ইত্যাদি করছে কিনা, সেটা কেন্দ্র দেখতে পারে না?

সব শেষে তৃণমূলের অসহযোগিতার কথায় আসি। মনে আছে সিঙ্গুর নিয়ে রাজভবনের সমঝোতা-কাহিনীটা? প্রাক্তন রাজ্যপালের উদ্যোগে রাজ্য-সরকার ও তৃণমূল-নেত্রীর একটা মতৈক্য হয়েছিল। শিল্পমন্ত্রী তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী সহাস্যে তৃণমূল-নেত্রীকে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিনই সরকার একটা বড় ডিগবাজি খেয়েছে— কোনও সমঝোতাই নাকি হয়নি। এই ধরনের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা যায়?

শ্রম সংস্কার হোক, কিন্তু কর্মসংস্থানের কি হবে?

ডঃ ভরত ঝুনঝুনওয়ালা

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রীজ এক সার্ভের মাধ্যমে জানাচ্ছে যে, দেশের শিল্প উন্নয়নের মূল অন্তরায় যেমন পরিকাঠামো, ঠিক তেমনটা হলো পুরানো শ্রম আইন। প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে, শ্রমসংস্কার না হওয়ায় দেশের কর্মসংস্থান ঠিক মতো হচ্ছে না। চিনি বা পর্যটন শিল্পগুলি মরসুম নির্ভর, সুতরাং মরসুমের পরবর্তী সময়ে এইসব শিল্পের শ্রমিকদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়া হয়ে থাকে পুরোনো আইনের সুবাদে। শ্রমিকদের মজুরী উচ্চ হলেও এবং অনেক অযোগ্য শ্রমিকদের বরখাস্ত করা যায় না। এইসমস্ত আইনের মার-প্যাঁচে উৎপাদনমূল্য বেড়ে যায়। তাই শিল্পপতিরা চেষ্টা করে শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্র বসানোর। এইজন্য ১৯৯৭ সালে সারাদেশে শ্রমিক সংখ্যা ২৮২ লক্ষ থেকে নেমে ২০০৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৬৪ লক্ষে। শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস করা সত্ত্বেও দেশে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।

আর্থিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব রয়েছে। আর্থিক উন্নয়নের অর্থ হলো অধিকমাত্রায় মূলধনের জোগান। এর অর্থ হলো মূলধনের কম মূল্য। এজন্যই উন্নত দেশগুলিতে সুদের হার কম। ওইসব দেশে যত ঋণ দেওয়া হবে ততই তার মূল্য কম হবে ঠিক যেমন অধিকমাত্রায় আলুর লরি এলে বাজারে আলুর দাম কমে যায়। আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে আবার শ্রমিকদের মজুরি বাড়ে। যেমন আমেরিকায় যখন এক অদক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৪ হাজার ডলার তখন ভারতে তা মাত্র দু'শো টাকা। এজন্যই উন্নত দেশগুলিতে শিল্পপতিরা উৎপাদন খরচ কমাতে শ্রমিকের বদলে অধিকতর মাত্রায় মেশিন ব্যবহার করে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদক্ষ কর্মীরা কাজ হারায়। আবার মেশিনপত্তর চালাতে, সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দরকার হয় দক্ষ কর্মীর। তাই আমরা দেখি আই আই টি-র স্নাতকরা বেশী বেতনের চাকরি পায়। আর অন্যত্র গরীবরা আমাদের দেশে অস্ত্র তুলে নিয়ে নকশাল হয়ে যায়।

কর্মীরা দু'তরফে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রথমত, মেশিন এসে তাদের কাজ কেড়ে নিচ্ছে। আবার বড় বড় কারখানায় সামনে এরা অসহায়। উদাহরণস্বরূপ, আগে গ্রামে-গঞ্জে কুটীর শিল্পে কত কী তৈরি হোত। কর্মীরা এইসব শিল্পে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেত। কিন্তু এখন ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে মাত্র একটা-ই চিনি কল। তাই কর্মীদের কাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে শিল্পপতিরা। এদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে হয় তাদের কম মজুরি দেওয়া হচ্ছে অথবা বেশী সময় কাজ করিয়ে নিচ্ছে একই মজুরিতে। সুতরাং সরকার শ্রমিক স্বার্থে আইন তৈরি করেছে। এখন কর্মীরা ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসছে। কর্মীরা তাই প্রভিডেন্ট ফান্ড, ডি.এ., ক্যান্টিন, পোশাক ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে পারছে। একই সঙ্গে মালিকরা শিল্পের আধুনিকীকরণ করছে। ফলে কর্মীরা কাজ হারাচ্ছে, অথচ মেশিন না হলে মানুষ অধিক সংখ্যায় কাজ পেত।

আমরা তাই শ্রম আইনে দু'রকম বৈপরীত্য দেখছি। শ্রম আইন দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রের প্রায় তিন কোটি শ্রমিকদের কাছে আশীর্বাদের মতো আর অন্যত্র বিপুল সংখ্যক মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চি ত করছে। আবার শ্রম আইন শিথিল করলে সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের বঞ্চি ত করে বেকার যুবকদের হাতে কাজ জোগাবে। আমাদের অবস্থা তাই জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ—আমাদেরই উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

আমরা তাই শ্রম আইনে দু'রকম বৈপরীত্য দেখছি। শ্রম আইন দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রের প্রায় তিন কোটি শ্রমিকদের কাছে আশীর্বাদের মতো আর অন্যত্র বিপুল সংখ্যক মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চি ত করছে। আবার শ্রম আইন শিথিল করলে সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের বঞ্চি ত করে বেকার যুবকদের হাতে কাজ জোগাবে। আমাদের অবস্থা তাই জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ —আমাদেরই উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' নীতি শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তিনি মনে করেন এতে কাজের সুযোগ বাড়বে। কিন্তু এমনটা যে হবেই তার গ্যারান্টি কোথায়? নোবেল বিজয়ী এডমন্ড ফেলপস বলেছেন, "এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা হলো যে, শ্রমিকদের খোলাবাজার মানেই যে তা বেকারত্ব দূর করবে এমন নয়, কিংবা এমনও নয় যে, অদক্ষ কর্মীদের দিয়ে উচ্চমানের দ্রব্য প্রস্তুত করানো যাবে এবং তারা উচ্চ মজুরীর শ্রমিকে রূপান্তরিত হবে। বাজারের শক্তিই এই অভূতপূর্ব বৈষম্য দূর করবে বলে মনে হয় না।"

কর্মসংস্থান সুনিশ্চি ত প্রকল্পের মাধ্যমে যে বেকারত্বের সমাধান হবে তাও নয়। অধ্যাপক ফেলপস্ বলেছেন, "এই ধরনের কর্মসূচী আমেরিকায় ও ইংল্যান্ডে গৃহীত হলেও গরীব কর্মীরা সেই আগের মতোই বঞ্চি ত। প্রকৃত অর্থে সামাজিক ব্যয় বরং সমস্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ এটা কাজের ইনসেনটিভ কমিয়ে দেয় এবং পরনির্ভরতা বাড়ায়। যা দরকার তা হলো উচ্চ হারে কর্মসংস্থান"।

কর্মসংস্থান সুনিশ্চি ত প্রকল্প এ ধরনের অসহায়তা বোধকে জাগ্রত করে এবং কর্মীদের মধ্যে পরনির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়। এই প্রকল্প তাদের কর্ম-সন্ধানের প্রবণতাকে খর্ব করে অথবা স্বনির্ভরতাকেও ব্যাহত করে।

তাই এহেন প্রকল্প মানুষের কর্মহীনতাকে আরও গভীরতর করে তোলে এবং তা একপ্রকার পরাভবের উদাহরণ। মনে হতে পারে সরকার এদেরকে সুরক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু সুরক্ষার নামে বরং এদের মধ্যে কর্ম অনুসন্ধানের স্পৃহাকে অবদমিত করছে এবং দীর্ঘমেয়াদী হিসেবে এদের গরীবিয়ানার ঘেরাটোপে কার্যত বন্দী করে রাখছে।

উপায়ন্তরের কথা বাতলেছেন সেই ফেলপস্। তাঁর মতে, "সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো কম-মজুরী কাজের জন্য উৎসাহী করতে অনুদান দেওয়া। এই মজুরি অনুদানের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি মালিকপক্ষকে আরও কর্মী নিয়োগে উৎসাহিত করবে, যার ফলে বেকারত্বের হার নীচে নেমে আসবে। এই অনুদান দেওয়া প্রয়োজন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই-শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য। মানুষ এই অনুদানের মাধ্যমে উপকৃত হবে কর্মীদের উৎপাদনকাজে নিযুক্ত করে। এমনই এক বার্তা 'ইয়ং ইন্ডিয়া' বইতে মাহাত্মা গান্ধী গত ১৯২১ সালের ১৩ অক্টোবর দিয়েছিলেন,—"আমি অবশ্যই কোনও উলঙ্গকে কাপড় দিয়ে লজ্জা দেব না যদি তা তার দরকার না হয়। বরং তাদের হাতে কাজ দেব যা তাদের অত্যন্ত জরুরী"। ডঃ মনমোহন সিং-এর উচিত অধ্যাপক ফেলপস্ ও মহাত্মা গান্ধীর বার্তাকে গুরুত্ব দেওয়া। সরকারের উচিত এমনসব প্রকল্প রচনা করা যা শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি করবে।

প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা ঠিকই যে, শ্রম সংস্কার হয়নি বলেই কর্ম-উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু তিনি প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন করলেন না। শ্রমসংস্কার সংগঠিত শ্রমিক তৈরি করবে যা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চি ত করবে। তবুও কাজের বাজার তৈরি করতে শ্রম সংস্কার দরকার। অধ্যাপক ফেলপস্-এর পরামর্শ মতো প্রথমে কর্ম অনুদান প্রকল্প তৈরি করতে হবে। যেমন কম বেতনের শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যে অংশ জমা দেয় তা সরকার দিক। পক্ষান্তরে, সমস্ত কর্মচারীদের জন্য সরকার কমপক্ষে ৫০০ টাকা অনুদান দিক। এইসব ব্যবস্থা আসলে কর্ম-সংস্থান বাড়াবে। শ্রম সংস্কার তখনই সম্ভব যখন অনুদানের সংস্থান হয়। এতে অবশ্য সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা কিছু হারাবে বটে, কিন্তু এই ব্যবস্থা নিশ্চি তভাবে বৃহদাকারে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলবে।

লেখক বিশিষ্ট অর্থনিতিবিদ

অ ঢ রকম

বাঁদরামি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'সত্য সেলুকাস। কি বিচিত্র এই দেশ।' দেশ যখন বিচিত্র, তখন তার ঘটনাবলী যে ততোধিক বিচিত্র হবে এতে আর আশ্চর্য কি! এবং সেই বিচিত্র ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণকারীরাও যে বিচিত্র হবে তাতেও তো আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। এহেন দু'টি বিচিত্র প্রাণীর নাম যথাক্রমে বাঁদর ও লেঙ্গুর। এবং এদের নিয়ে যাদের জীবন অতিষ্ঠ জনমানসে তাদেরও বিচিত্রতার রূপ ধরা পড়েছে। এঁরা হলেন এদেশের স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ্‌গণ। এঁদের নিবাস দিল্লী। প্রসঙ্গত, জানিয়ে রাখা যাক ব্যাকরণগত দিক দিয়ে 'বাঁদরামি' শব্দটা ভারি গোলমেলে। 'বাঁদরামি'র সন্ধি করলে হয়— 'বাঁদর ন আমি'। নিজের সত্ত্বার সঙ্গে বাঁদর যুক্ত হোক, এটা কে-ই বা চান বলুন!

দিল্লীর মহাদেব রোডে বাস করা জনা-কুড়ি সাংসদের অবস্থাটা এখন এরকমই। বাঁদরের বাঁদরামি রুখতে তারা এখন ভরসা করছেন লেঙ্গুরের ওপর। Nacaca প্রজাতির অর্থাৎ বাঁদরের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এই লেঙ্গুরেরা। এদের ল্যাজগুলো একটু বড় হয় আর বাঁদরের তুলনায় তাদের দেহটা বেশ ছোট। ইদানীং মহাদেব রোডে বাস করা বাঁদরগুলোর বাঁদরামি সীমাহীন পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এমনিতে ওখানে যেসব কংগ্রেসী সাংসদরা বাস করেন তাঁরা হলেন রাজ ববর (২০ নম্বর বাড়ি), পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর থেকে নির্বাচিত প্রতাপ সিং বাজওয়া (২২ নম্বর বাড়ি), উত্তরাখণ্ড থেকে নির্বাচিত সতপাল মহারাজ (২৮ নম্বর বাড়ি), পাঞ্জাবের সাংরুর থেকে নির্বাচিত বিজয় ইন্দের সিংলা (৩০ নম্বর বাড়ি)। এর পাশাপাশি বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র প্রকাশ জাবড়েকর এবং ঝাড়খণ্ড থেকে নির্বাচিত নির্দল সাংসদ ইন্দর সিং নামধারী-র বাড়িও সেই মহাদেব রোডে।

বাঁদরগুলো করছে কি ওই সাংসদদের বাসভবন সংলগ্ন শাক-সব্জীর বাগানে ঢুকে তা তছনছ করছে, ওয়াটার-ট্যাঙ্কে দিব্যি নেমে স্নান করছে। ঢাকনা খুলে সাংসদদের জন্য রাখা খাবার-দাবার খেয়ে নিচ্ছে। এবং খেয়ে-দেয়ে ধীরে সুস্থে জামা-কাপড় নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। কোনওমতেই দোর্দন্ডপ্রতাপ সাংসদরা এই বাঁদরগুলোকে বাগ মানাতে পারছিলেন না। ফলে বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে জুটছিল নিত্য-গঞ্জনা। অকস্মাৎ তাঁরা বাঁদর ঠেকাতে উপযুক্ত পাহারাদার হিসেবে আবিষ্কার করলেন লেঙ্গুর-কে। কিন্তু বিনা পয়সায় পাহারাদার হতে কি আদৌ রাজি হবে লেঙ্গুরেরা?' বিজেপি নেতা প্রকাশ জাবড়েকর জানাচ্ছেন, "মহাদেব রোডে আমাদের বাসভবনে ইদানীংকালে বাঁদরদের দৌরাত্ম্য খুব বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণে লেঙ্গুরদের আমরা চাকরি-তে নিয়োগ করছি। এই নিয়োগে প্রতিটা লেঙ্গুরের পেছনে প্রায় ৭০০০ টাকা খরচ হবে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সাংসদ-বাংলোর বাইরে পাহারা দেবার কাজ করবে তাঁরা। দলমত নির্বিশেষে সব সাংসদ লেঙ্গুর নিয়োগের এই অর্থের সঙ্কুলান করবে।"

অবশ্য লেঙ্গুরের কাছে এই মাইনে 'ক্যাশে' নয়, 'কাইণ্ডে' অর্থাৎ ফল-মূল, কিংবা শাক-সব্জী ইত্যাদির মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে। সুতরাং বাঁদরের বাঁদরামি রুখতে ভরসা তাই লেঙ্গুরের বাঁদরামি-ই।

প্রকাশ জাবড়েকরের বাংলো পাহারায় একটি লেঙ্গুর।

নাগাল্যাণ্ড সন্ত্রাসবাদের রাষ্ট্রীয়করণ না সন্ত্রাসবাদের কাছে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আত্মসমর্পণ

সাধন কুমার পাল

সন্ত্রাসবাদীরা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্য দশটা মূল স্রোতের সংগঠনের মতো সর্বসমক্ষে দপ্তর খুলে সংগঠনের কাজ পরিচালনা করছে, সরকারি কর কাঠামোর সমতুল ব্যবস্থা তৈরি করে রাজনীতি ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তিটি থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে, আমজনতার করণীয়-অকরণীয় সম্পর্কে নিয়মকানুন বেঁধে দিচ্ছে, বিদেশে রাজার হালে বসবাসকারী সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্বদেশ ভ্রমণ উপলক্ষে তোপ ধ্বনিসহ সামরিক রীতিতে গার্ড অফ্ অনারের আয়োজন করছে। না, এরকম একটি দৃশ্য দেখতে হলে কষ্ট করে পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে যেতে হবে না, আমাদের দেশেরই একটি রাজ্য নাগাল্যাণ্ডে গেলে এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে।

উত্তরপূর্বের এই রাজ্যটিতে এরকম দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে মূলত ১৯৯৭-এ। প্রথমে এন এস সি এন-এর আইজাক-মুইভা গোষ্ঠী ও পরে খাপলাং গোষ্ঠীর সাথে ভারত সরকারের সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণার পর থেকে। ভারত সরকার নাগা শান্তিবার্তার নামে ইউরোপের আমস্টার্ডামে রাজার হালে থাকা এন এস সি এন (আই-এম)-এর শীর্ষ নেতা আইজাক চি স্যু এবং থুঙলাঙ মুইভাকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মতো ভারতে এনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে বসিয়ে, আলাপ আলোচনা করে বা উচ্চপর্যায়ের সরকারি দূতকে বিদেশে পাঠিয়ে এদের সাথে বার্তালাপ চালিয়ে কালহরণ করে আপাত স্বস্তিতে থাকলেও স্বাধীন নাগাল্যান্ড গঠনের লক্ষ্যে এদের শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া একদিনের জন্যও থেমে নেই। এতদিন ভূমিগত বা গোপনে থেকে এরা নাগাল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ থাকলেও ২০১০-এ এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার থেকে প্রমাণ হয় যে দীর্ঘ সময় ধরে বলবৎ থাকা সংঘর্ষ-বিরতির চুক্তির নামে সরকারি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো এখন রাজ্যটির রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এমনকী সামাজিক ক্ষেত্রেও শেষ কথা হয়ে উঠেছে।

ঘটনা এক, গতবছর (২০১০) সরকার ও বিরোধী পক্ষ সম্মিলিতভাবে নাগাল্যাণ্ড বিধানসভায় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব পাশ করে।

ঘটনা দুই, এন এস সি এন দুটো গোষ্ঠীই 'নাগা ফেডারেল গভর্ণমেন্ট' নামে দুটো পৃথক স্বঘোষিত তথাকথিত স্বাধীন সার্বভৌম ভূমিগত সরকার চালায়। নাগাল্যাণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেকেই দুটো ভূমিগত সরকারকেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের করের আদলে বিভিন্ন রকম ভাবে অর্থ দিতে হয়। আমজনতা এটাকে বন্দুকের মুখে তোলাবাজী বললেও সন্ত্রাসবাদীদের ভাষায় ওটা নাকি 'কর'। ১৯৫৬ সালের ২২ মার্চ চরমপন্থী নেতা এ জেড ফিজোর নেতৃত্বে গঠিত এই ধরনের তথাকথিত ভূমিগত 'নাগা ফেডার‍্যাল গভর্ণমেন্টকে বন্দুকের মুখে তোলা দিতে দিতে রাজ্যবাসী অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই তোলাবাজী এতটাই স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে যে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে ওদের দাবী মতো অর্থ না দিয়ে নাগাল্যাণ্ডে বসবাস করার চিন্তা অ-নাগা সম্প্রদায়ের লোকেরা তো বটেই নাগা সম্প্রদায়ের লোকেরাও করতে পারে না।

নিয়ম করে অর্থ আদায় ছাড়াও হুমকি চিঠি দিয়ে অর্থ আদায় নাগাল্যাণ্ডে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এদের চাহিদা মতো অর্থ দিতে না পারলে হয় নাগাল্যাণ্ড ছাড়তে হবে না হয় প্রাণ দিতে হবে। এটাই ওই রাজ্যের অলিখিত নিয়ম। নাগা জঙ্গিদের চাহিদা মতো অর্থ দিতে না পেরে নাগাল্যাণ্ডে কত মানুষের যে সর্বনাশ হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। প্রশাসনে অভিযোগ করে কোনও লাভ নেই। কারণ প্রশাসন যন্ত্রটিই এদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। এখনও শোনা যায় যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তো বটেই, এমন কী নাগাল্যাণ্ডের থানাগুলোকেও জঙ্গিদের নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। এরকম একটি পরিস্থিতিতে নাগাল্যাণ্ড বিধানসভায় জঙ্গিদের অবদান স্বীকার করে পাশ করানো প্রস্তাব কতটা ভয়মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার ফসল তাতে কিন্তু

থুঙলাঙ্ মুইভা

আইজাক চিস্যু

সন্দেহ থেকেই যায়। নাগা জঙ্গিদের বিভিন্ন রকম চাপ সহ্য করতে না পেরে অর্থবান শিক্ষিত সজ্জন নাগাদের একটা ভালো অংশের মধ্যে নাগাল্যাণ্ড ছেড়ে দিল্লি, বাঙ্গালোরের মতো শহরগুলোতে বসবাস করার প্রবণতা বহুদিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে নাগা জঙ্গিদের অন্যায় তোলাবাজী, খুন, অপহরণের বিরুদ্ধে ব্যবসা বনধ্ ও প্রতিবাদ মিছিল করে অনেকেই সোচ্চার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এদের এই চেষ্টায় জল ঢেলে দিলেন নাগাল্যাণ্ডের স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী ইমকং ইমচেন স্বয়ং। গত ৩০ নভেম্বর ২০১০ কোহিমায় সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, মানুষের উপর চাপ হলেও জঙ্গিদের কর আদায় বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, অর্থ ছাড়া জঙ্গি সংগঠনগুলোর পক্ষে তাদের কর্মসূচী চালু রাখা সম্ভব নয়। সর্বশেষে তিনি জঙ্গিদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন তারা যেন তাদের কর কাঠামো বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে জানিয়ে দেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে জঙ্গিদের কাজকর্মে সরকারি সীলমোহর প্রদানের ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদের কাছে রাষ্ট্রব্যবস্থার আত্মসমর্পণ বলা হবে না সন্ত্রাসের রাষ্ট্রীয়করণ বলা হবে এই নিয়ে যুতসই বিতর্ক চলতে পারে।

তবে আশঙ্কাজনক ঘটনাবলীর এখানেই শেষ নয়। ২০১০-এর মাঝামাঝি সময়ে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল (এন এন সি)-এর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক সম্পর্কে যতটুকু খবর বাইরে এসেছে তার সারমর্ম হলো, নাগারা ভারতের কাছে স্বাধীনতা দাবী করবে না, কেন না ভারত স্বাধীন হওয়ার একদিন আগেই অর্থাৎ ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট নাগারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। নাগারা তাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রচণ্ড আশাবাদী। ইংরেজরা যেমন এক সময় ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল ঠিক একই রকমভাবে ভারতও নাগাল্যাণ্ড ছাড়তে বাধ্য হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এন এন সি-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে এতটা উদ্বেগ আশঙ্কার কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য এন এন সি নামক সংগঠনটির ইতিহাসের দিকে একবার চোখ রাখা যেতে পারে। এন এন সি হয়ে ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত নাগাদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনটির মধ্যে চরমপন্থী ও নরমপন্থী নাগা নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ এবং নাগাদের উপর অসমের প্রবাদপ্রতিম নেতা গোপীনাথ বরদলৈর প্রভাব থাকার জন্য ৪৭-এ স্বাধীনতার প্রাক্কালে নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডের আওয়াজকে জোরদার করতে পারেনি। ১৯৫০-এর ৫ আগস্ট গোপীনাথ বরদলৈর অকালপ্রয়াণ ও এন এন সি-র নেতৃত্ব চরমপন্থীদের হাতে চলে যাওয়ার জন্য নাগাল্যাণ্ডের পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। ১৯৪৯-এ নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা এ জেড্ ফিজো এন এন সি-র সভাপতির দায়িত্ব নেন। এই ফিজোর ডাকে ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচন ও পরে অসম বিধানসভার (তখনও নাগাল্যাণ্ড পৃথক রাজ্য হয়নি) জন্য নির্ধারিত তিনটি আসনে নাগারা নির্বাচন বয়কট করে।

এরকম একটি জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রতিবেশী বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) প্রধানমন্ত্রী উ-নু'কে সাথে নিয়ে নাগাল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিলেন। ১৯৫৩-র ৩০ মার্চ নেহরু ও প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে কোহিমার ফুটবল ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এক বর্ণাঢ্য নাগা নৃত্যের মাধ্যমে উষ্ণ সংবর্ধনা পেয়ে সেদিন প্রথমে নেহরু অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে এন এন সি নেতৃত্বের সাথে কোনও একটি কারণে মতবিরোধ হওয়াতে সেদিন কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায় বিদেশি প্রধানমন্ত্রীর সামনে এই অপমান সইতে না পেরে ফাঁকা মাঠে কিছুক্ষণ চিৎকার করে জওহরলাল নেহরু সেদিন এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে তার সচিবকে ডেকে নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন 'সেন্ড আর্মি এন্ড কিল নাগাজ্'। যাই হোক, এর পর থেকেই নাগাল্যাণ্ডে শুরু হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভূতপূর্ব দমন পীড়ন। এন এন সি যেহেতু উগ্রপন্থাকে সমর্থন করে না সেজন্য ফিজো এন এস সি এন নামে নতুন সংগঠন তৈরি করে লুঠপাঠ, খুন, অপহরণ, সুরক্ষাবাহিনীর উপর আক্রমণ করে পাল্টা আঘাত হানতে লাগল। নাগা পাহাড় হয়ে উঠল সন্ত্রাসবাদের লীলাভূমি। তখনও অনেকেই মনে করেন সেদিন নেহরু উত্তেজনার বশে বল প্রয়োগ করে নাগাদের বশে আনার চেষ্টা না করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিলে আজ নাগাল্যাণ্ডের পরিস্থিতি অন্যরকম হতো।

অপ্রিয় সত্য এটাই যে নেহরুর সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ক্ষমতাশীলদের মধ্যে দায়হীন ক্ষমতা ভোগের প্রবণতার ফলে নাগা সেন্টিমেন্ট ও এই সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি শক্তি কিভাবে ইংরেজ শাসকদের মস্তিষ্কপ্রসূত 'ক্রাউন কলোনী' ধাঁচে নাগাল্যাণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে, এই বিষয়টি কেউ গভীরভাবে ভাবার চেষ্টা করেনি বা ভাবলেও কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখায়নি। দার্জিলিং সমস্যার ক্ষেত্রে যেমন এক সময় সুভাষ ঘিসিংকে ক্ষমতায় বসিয়ে দায়হীন অর্থ খরচের সুযোগ দিয়ে সমস্যাকে জটিল করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক একই রকমভাবে নাগাল্যান্ডের মতো উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতেও এতদিন সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে সস্তা ক্ষমতার রাজনীতি করার ফলে পরিস্থিতি আজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। ফলস্বরূপ সভাপতি হয়েও যে এন এন সি-কে একসময় ফিজো উগ্রপন্থার পথে টেনে আনতে পারেনি সেই সংগঠনটি আজ এন এস সি এন-এর সাথে সুর মিলিয়ে নাগাল্যাণ্ডের সার্বভৌমত্বের দাবি তুলছে।

বছর শেষের মূল্যায়ণ করতে বসে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই বছরটিতে মাওবাদী সন্ত্রাসের বাড়বাড়ন্ত, শতাধিক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু, কাশ্মীরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ঘটনা পাশে সরিয়ে রেখে, নাগাল্যাণ্ডের মতো রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণের ঘটনা অনুল্লেখ রেখে তথ্য পরিসংখ্যানের মারপ্যাঁচ খাঁড়া করে ২০১০ সালটিকে সন্ত্রাস দমন ইস্যুতে সফলতম বছর ও পি. চিদাম্বরমকে সফলতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেছে। কংগ্রেস দলের প্লেনারি অধিবেশনের মঞ্চ থেকে ভারতে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর কারণ হিসেবে ১৯৯০ সালে লালকৃষ্ণ আদবানির রথযাত্রা ও ১৯৯২ সালে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসকে দায়ী করে সন্ত্রাসের আঙিনায় হিন্দুত্ব-কে টেনে আনার প্রয়াস করা হয়েছে। কংগ্রেস দলের এই বিশ্লেষণ ধরে এগোলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, প্রায় একশো শতাংশ খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত নাগাল্যাণ্ড, মিজোরামের মতো রাজ্যগুলো কেন আজ সন্ত্রাসের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে? স্বাধীনতার পর থেকে তো কংগ্রেস দলই কেন্দ্র ও এই রাজ্যগুলোতে দীর্ঘ সময় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্ষমতায় থেকেছে। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় তাদেরই বেশি। তবে এই প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন কংগ্রেস দলের প্লেনারি অধিবেশনের মঞ্চ থেকে যেভাবে সন্ত্রাসবাদের পায়ে ধর্মীয় ও রাজনীতির রঙ লাগানোর প্রয়াস করা হয়েছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে নিজের ঢাক নিজে পিটিয়েছেন তা থেকে এটা পরিস্কার যে সমস্যার মূলে না গিয়ে সমস্যা-কে ধামাচাপা দিয়ে, সন্ত্রাসের মতো ভয়ংকর বিষয়কে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতা ধরে রাখা বা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের চেষ্টা হয় বলেই উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ গোটা দেশ আজ বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

মালদা থেকে নারী পাচারের সংখ্যা বাড়ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলাতে নারীপাচারের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসন ও জনসাধারণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মালদা জেলাতে গত এক বছরে ৯৪ টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ৪৫ জন মহিলার কোনও খোঁজ নেই। একইভাবে গত এক বছরে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৪৬ টি নারী পাচারের ঘটনা ঘটেছে। এদের মধ্যে ৩৩ জনের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। দুই জেলাতেই অপহরণে নাবালিকার সংখ্যাই বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ও কাজের টোপ দিয়ে নাবালিকাদের ভিন রাজ্যে পাচার করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকেও নারী পাচার হয়ে এদেশে আসছে। কাজের টোপ দেখিয়ে নারীদের দিল্লি, পুণে, গুয়াহাটি, হরিয়ানাতে নিয়ে গিয়ে মোটা টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে দুবাইতে নারী পাচার করে নিয়ে যাওয়ার একটি চক্রের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। মালদা জেলার কালিয়াচক ও হরিশচন্দ্রপুরে নারী পাচারের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী— মোট ২৮ জন। তার পরেই আছে ইংলিশবাজার ও চাঁচল। সেখানে ২৬ জন নারীকে গত এক বছরে অপহরণ করা হয়েছে। গত ৩০ নভেম্বর মালদা জেলার হরিপুরে টিউশন পড়ে বাড়ি আসার পথে হঠাৎই নিখোঁজ হয় সপ্তম শ্রেণীর দুই ছাত্রী পূর্ণিমা হালদার ও লতিকা হালদার। হবিবপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। গত ১০ ডিসেম্বর ওই দুই ছাত্রীকে দিল্লি পুলিশ নয়ডা এলাকা থেকে উদ্ধার করে তাদের অভিভাবকের হাতে তুলে দেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি এসি কলেজ অব কমার্সের অধ্যাপক ডঃ সিদ্ধার্থ সরকার এক সমীক্ষা চালিয়ে জানিয়েছেন, নারী পাচার চক্রের আন্তর্জাতিক করিডর হিসাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে নারীপাচার চলছে ব্যাপক হারে। গবেষকদের সমীক্ষায় আরও জানা গেছে যে মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানেও নারী পাচার চলছে উত্তরবঙ্গকে ব্যবহার করেই। দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও বেশী কন্যাসন্তানের জন্য তাদের অবহেলার সুযোগে নিয়ে কিছু দালাল এইসব অল্প বয়সী জনজাতি ও মুসলিম নারীদের পাচার করে বিরাট অঙ্কের টাকা রোজগার করছে। এইসব নারীদের যেমন দেহব্যবসার কাজে লাগানো হচ্ছে তেমনি বিদেশে পাচার করে তাদের চিরদিনের মতো মা-বাবাদের কাছে ফিরে আসার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নারীপাচার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছে মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলাতে। উত্তর দিনাজপুরে সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং মালদা জেলাতে 'স্পার' ছত্রত্রট্টত্মগ্ন নারী পাচার প্রতিরোধে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে এবং বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জনসচেতনতা বিস্তারের কাজ করে চলেছে।

২০১১ কি কংগ্রেসের পক্ষে অনিশ্চয়তার বছর হয়ে উঠবে ?

তারক সাহা

১৯৭৭ থেকে ২০১১— দীর্ঘ ৩৪ বছর এ রাজ্যে ক্ষমতায় নেই কংগ্রেস। সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসে জগদ্দল পাথরের মতো। ভারতীয় গণতন্ত্রে এমনটা বিরল। প্রায় বিরোধীশূন্য অবস্থায় ৩৪ বছর রাজত্ব চালালো সিপিএম। এতে সিপিএমের যত না কৃতিত্ব তার চেয়ে কৃতিত্ব বেশি কংগ্রেসের। কারণ হরকিষেণ-জ্যোতি বসুরা কংগ্রেসের সঙ্গে তালমিল করে এতদিন এ রাজ্যে একচ্ছত্র রাজত্ব চালাতে পারলো। কংগ্রেসের মধ্যে অনেকে 'স্পাই'-এর কাজ করেছে। এরা সবাই সিপিএমের কাছ থেকে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়েছে। অনেকেই সিপিএমের দাক্ষিণ্যে এম পি, এম এল এ হয়েছে। তাই অন্য রাজ্যে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি বা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মানসিকতা কাজ করলেও এখানে তা সম্ভব হয়নি। সোজা কথায় বলা যায় একটা নিষ্কর্মা সরকার এতদিন রাজ্যপাট চালিয়ে গেল কংগ্রেসী সহায়তায়।

কংগ্রেসের এখন বড় দুঃসময়। এদিকে নতুন বছর পড়ে গেল। কেমন যাবে কংগ্রেসের এই নয়া সালটা? প্রশ্নটা জ্যোতিষদের হলেও আম-আদমির একজন হিসেবে বলা যায়, সময়টা ভালো নয় সোনিয়া অ্যান্ড কোং-র। একের পর এক দুর্নীতির নাগপাশে আবদ্ধ কংগ্রেস, বিহারে শোচনীয় পরাজয়, অন্ধ্রপ্রদেশে জগমোহন রেড্ডির বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রে শরদ পাওয়ারের সঙ্গে মনকষাকষি, খাদ্যদ্রব্যের ১৮ শতাংশের ঊর্দ্ধে মুদ্রাস্ফীতি, তামিলনাড়ুতে জোট সঙ্গী ডি এম কে-র শোচনীয় অবস্থা ইত্যাদি ঘটনাগুলি সোনিয়াজীর কপালের ভাঁজ আরও বাড়িয়েছে। এমনই শোচনীয় অবস্থা যে শাশুড়ী-দেওরের জরুরী অবস্থার সমালোচনা করতে হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম যারা ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থায় পর জন্ম তাদের সংখ্যাই বর্তমান ভোটদাতাদের মধ্যে বেশি। তাদের জরুরী অবস্থায় অপকর্মের কথা খুঁচিয়ে তুলে অতীতের ভুলের জন্য কার্যতঃ ক্ষমা চাইলো সোনিয়া এ্যাণ্ড কোং।

আগামী এপ্রিল-জুনে দেশে যে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হতে চলেছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভালো— সেইজন্যে মমতার তৃণমূল। বাংলায় মানুষ মমতাকে অগতির গতি হিসেবে বাম অপশাসনের বিকল্প হিসেবে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সিপিএম বুঝতে পারছে তাদের বিদায় প্রায় আসন্ন। বাহাত্তরের সিদ্ধার্থ রায়ের অত্যাচারের কথা বলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া কঠিন। এমন কিছু ইস্যু তাদের হাতে নেই যার ওপর ভর দিয়ে এবারটা উতরে যেতে পারে। বরং মমতা রেলে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পেরেছেন। আর কিছু হোক বা না হোক কতগুলি ট্রেন বাড়িয়ে, ট্রেনের নাম্বার বদলে, মেট্রো রেলকে সতেরোতম জোন হিসেবে আম-আদমির মনে একটা আশার আলো জাগাতে পেরেছেন। জনতা ভাবছে অপদার্থ বাম জমানা তো শেষ হোক!

অতীতে কংগ্রেসের লেজুড় হয়েছিল আঞ্চলিক দলগুলি। এবারে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে ছোট দলগুলির লেজুড়। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে'— এই থিওরির উদগাতা রাহুলজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিহারে কার্যত ব্যর্থ। জিতলে আদর, হারলে বাঁদর— এই থিওরিতে পড়ে গিয়েছেন রাহুল। বিহারের নির্বাচনের ঠিক আগে এ রাজ্যের মানস ভুঁইঞা-দের হম্বি-তম্বি গ্যাস বেলুনের মতো চুপসে গেছে। এখন কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে মমতা যদি পঞ্চাশটি আসন কংগ্রেসকে দেয় এবং ওই প্রসাদ খেয়ে প্রণববাবুরা যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।

এমনই আশা কংগ্রেসের। অতীতে কংগ্রেসের লেজুড় হয়েছিল আঞ্চলিক দলগুলি। এবারে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে ছোট দলগুলির লেজুড়। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে'— এই থিওরির উদগাতা রাহুলজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিহারে কার্যত ব্যর্থ। জিতলে আদর, হারলে বাঁদর— এই থিওরিতে পড়ে গিয়েছেন রাহুল। বিহারের নির্বাচনের ঠিক আগে এ রাজ্যের মানস ভুঁইঞা-দের হম্বি-তম্বি গ্যাস বেলুনের মতো চুপসে গেছে। এখন কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে মমতা যদি পঞ্চাশটি আসন কংগ্রেসকে দেয় এবং ওই প্রসাদ খেয়ে প্রণববাবুরা যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। এদিকে সোনিয়া ভাবছেন মমতা তো দলছুট কংগ্রেসী, সুতরাং কেন্দ্রে যেমন মমতা ক্ষমতায় আস্বাদ পাচ্ছেন তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস তৃণমূলের ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতায় আস্বাদন পেতে পারবে।

এদিকে সিপিএমের অবস্থা করুণ। চিদাম্বরমের চিঠি সোনিয়ার নির্দেশ ছাড়া যে লেখা হয়নি তা একরকম নিশ্চিত। আলিমুদ্দিন বাংলা থেকে দিল্লির কর্তাদের কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছে তাতে জ্যোতিবাবুর লাইন— অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে 'তালমিল' অনুসরণ করতে। কিন্তু কেন্দ্রে কংগ্রেসের যে হাল তাতে সোনিয়া গান্ধীর বেশি প্রয়োজন মমতাকে। কারণ আগামী বাজেট অধিবেশন— আবার সংসদ অচল হবার সম্ভাবনা। সেখানে সিপিএম যতই বিড়ম্বনা হোক বিজেপি-র সঙ্গে কক্ষ সমন্বয় করবে। তামিলনাড়ুতে রাজা-কাণ্ডের পর সোনিয়া করুণানিধির করুণা কাটিয়ে জয়ললিতার সঙ্গে রাজ্যে সমঝোতা করবেন কিনা ভবিষ্যৎ-ই তা বলবে! বিগত এন ডি এ জমানায় একমাত্র পেঁয়াজের দাম অত্যধিক (২০/৩০ টাকা) হওয়ায় দিল্লিকে বলি দিতে হয়েছিল। এবার কিন্তু কেবল পেঁয়াজ নয়, দেশের সমস্ত কৃষিজ পণ্যের দাম ঊর্ধ্বগামী হওয়ায় শরদ পাওয়ারের ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছেন সোনিয়ারা। প্রশংসা মধুর হলেও নিন্দা সবসময়ই তেতো। তেতো ফল খেয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে শরদের সম্পর্কটা তেতো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। শোনা যাচ্ছে, তলে তলে অন্ধ্রে জগমোহন রেড্ডিকে হাওয়া দিয়ে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারকে সবচেয়ে বেশি এম পি সরবরাহকারী রাজ্যে কংগ্রেসের ভেতর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে জীইয়ে রাখতে চাইছেন শরদ পাওয়ার।

এখন তো আবার তেলেঙ্গানা রাজ্য নিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছে কংগ্রেস। শ্রীকৃষ্ণ কমিশন যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে ২০১০-এর শেষ দিনে তাতে যেখানকার জল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বরং অবস্থা আরও জটিল হয়েছে। তেলেঙ্গানা পৃথক রাজ্য কেন্দ্র না মেনে নিলে আরেক প্রস্থ বিদ্রোহ হবে কংগ্রেসে। বাংলায় সোনিয়ার দূত কেশব রাও রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘরোয়া রাজনীতিতে ফিরে যেতে চাইছেন। আশা যদি ফাঁক-ফোকর দিয়ে তেলেঙ্গানায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়।

এবারের রাজ্য-রাজনীতিতে মমতার সঙ্গে মিল গড়তে প্রণববাবুকে পাঠিয়েছেন সোনিয়া। অবস্থা যে দিকে গড়াচ্ছে তাতে মমতার সখ্যতা প্রণববাবুর সঙ্গে বেশি। কারণ মানস-অধীর-দীপা এই ত্রয়ী নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের চক্ষুঃশূল। গতবারের নির্বাচনের সময় প্রণববাবুর ওপর সোনিয়ার যে প্রত্যয় ছিল এবারের প্রত্যয় ঢের বেশী। সবাই জানে প্রণববাবু বামঘেঁষা। তাই মমতার সঙ্গে সমঝোতা যাতে ভেস্তে না যায় সেইজন্য কেশব রাওকে পাঠিয়েছিলেন। অন্যত্র বুদ্ধ বাবুদের সঙ্গে প্রণবের সম্পর্ক নরমে-গরমে। কখনও বুদ্ধ বাবুর পাশে বসে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করছেন আবার কখনও মমতার ভাষাতেই বুদ্ধ বাবুদের বিঁধছেন। আবার প্রণববাবু ইন্দিরা জমানার শরিক হলেও তাঁকে দিয়েই ইন্দিরা-নিন্দার খসড়া তৈরি করাচ্ছেন সোনিয়া।

এমন বৈপরীত্য-ই এখনকার রাজনৈতিক নেতাদের ধর্ম-কর্ম। আজকের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 'অ্যাড-হক'-ইজম জাঁকিয়ে বসেছে বাকি সব ইজম্‌কে পাশে সরিয়ে। এই 'অ্যাড-হক' ইজমের শিকার সাধারণ মানুষ। ইউ পি এ সরকার থেকে মানুষ একটা অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছে— তা হলো দেশের দুর্বলতম প্রধানমন্ত্রী হলেন মনমোহন সিং। কংগ্রেসী রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা অনেকটা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো। ২০০৮ সাল থেকে টেলিকম মন্ত্রকে এ রাজার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকলেও মনমোহন নিরুত্তাপ, নিরুদ্বেগ। হয়ত এ রাজার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হননি সোনিয়ার জোট-রাজনীতির চাপে। অনেক বেশী টাকা দিয়ে জাতিকে এর মূল্য দিতে হলো। মানুষ আরেকটা দিক দেখলো যে, কোনও শিক্ষাবিদের দেশের প্রশাসনের শীর্ষকর্তা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সোনিয়াজী-র ব-কলমে এই প্রধানমন্ত্রীকে দূরে ঠেলে আসল নেতা হিসেবে উঠে আসছেন প্রণববাবু। গত ২ জানুয়ারি বিধানভবনে প্রণববাবু স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারীতে মনমোহনের পি এ সি-র সামনে হাজিরা নিয়ে যেভাবে বিঁধলেন মনমোহনকে তাতে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। অনেকের প্রশ্ন, সোনিয়াজীর বক্তব্য প্রণববাবুর মুখ দিয়ে বেরোল না তো?

এহেন প্রধানমন্ত্রী যদি দেশ চালান তাহলে আম-আদমির কী দশা হবে তা সহজে অনুমান করা যায়। বলা হয়ে থাকে মনমোহন নাকি নরসিংহ-র আমলের অর্থনৈতিক সংস্কারের জনক। এই আর্থিক সংস্কারের ভাল-মন্দ যা-ই থাকুক না কেন তার কৃতিত্বটা সবটাই পাওনা নরসিংহ রাও-এর। মনমোহন যে সাহসী নন, বরং উল্টোটা;তা ইউ পি এ-২ শাসনকালে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিধানভবনে প্রণববাবু কার্যত বলেছেন যে, পি এ সি-র সামনে হাজির হওয়ার বিষয়টা কংগ্রেসের পার্টি লাইন নয়, ওটা মনমোহনের ব্যক্তিগত অভিমত। সরকারের এক নম্বর ব্যক্তির বিরুদ্ধে দু-নম্বর ব্যক্তির এমন মন্তব্য আসলে মনমোহনের কর্তৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ জানানোর সামিল।

সুতরাং কংগ্রেসের এমন টাল-মাটাল অবস্থায় আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের বাজেট অধিবেশন কতটা মনমোহনের পক্ষে সুখকর হবে সেটা বড় প্রশ্ন। রাজনৈতিক ফায়দা কংগ্রেসের কাছ থেকে তুলতে না পারলে সংসদে বিজেপি-র সঙ্গে কক্ষ সমন্বয়ে সিপিএম সামিল হবে এটা একরকম পাকা। আর যদি স্পেকট্রাম ইস্যুতে বাজেট অধিবেশন বিরোধীরা চলতে না দেয় তার ফল কি অসময়ের নির্বাচনের দিকে গড়াবে— সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন? তাই ২০১১ সালটা কংগ্রেসের পক্ষে অনেকটাই অনিশ্চয়তার বার্তা দিয়ে শুরু হলো— এমনটা বলা যায়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার
বিরোধীদের যোগ্য জবাব ইয়েদুরাপ্পার

মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেন পরিচিয়তে।' এর সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে বিরোধীদের সব সমালোচনার জবাব ব্যালট বক্সেই দিল ইয়েদুরাপ্পার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি। সম্প্রতি কর্ণাটকের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আশাতীত ভাল ফল করেছে বিজেপি। ৩০টি জেলা পরিষদের মধ্যে ১২টি জেলা পরিষদ দখল করেছে বিজেপি। সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে এই ফলাফল-কে অসাধারণ বলা হয়তো যাবে না। কিন্তু গত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ফলাফল যে বিজেপি-র দিক দিয়ে বিশাল 'অ্যাচিভমেন্ট' এনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ২০০৫-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাত্র ১টি জেলা-পরিষদ-ই দখল করতে পেরেছিল তারা। আসলে কর্ণাটকে বিজেপি-র অবস্থা অনেকটা এরাজ্যের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-উত্তর বিরোধীদের মতো। জনভিত্তি আছে কিন্তু সংগঠন সেভাবে নেই। কংগ্রেস ও জনতা দল (সেকুলার) পরিচালিত পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা-পরিষদগুলো এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে মানুষ এদের বিদায় করবার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। যে কারণে কংগ্রেস আর তার সহযোগী দলগুলোর হতশ্রী দশা হয়েছে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে। গতবার যেখানে ২২টি জেলা-পরিষদ দখলে ছিল কংগ্রেসের এবার তার ১৮টি খুইয়ে মাত্র চারটি জেলা পরিষদ দখলে রাখতে পেরেছে তারা। সমীক্ষকেরা বলছেন, ২০০৭-এর কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের যে খারাপ ফল হয়েছিল, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার চাইতেও কম ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। শুধু কংগ্রেস-ই নয়, নির্বাচনে কংগ্রেসের সহযোগী এইচ ডি দেবেগৌড়া এবং তার পুত্র এইচ ডি কুমারস্বামীর জনতা দল (সেকুলার)-এর নির্বাচনী ফল অত্যন্ত খারাপ। জনতা দল (সেকুলার) মাত্র চারটি জেলা-পরিষদ দখল করেই সন্তুষ্ট থেকেছে। দশটি জেলা পরিষদ এখনও ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে।

শুধু জেলা পরিষদেই নয়, পঞ্চায়েত সমিতিতেও বিজেপি-র ফলাফল যতটা ভাল হয়েছে ঠিক ততটাই খারাপ হয়েছে কংগ্রেস ও তার সহযোগী জনতা দল (সেকুলার)-এর। বিজেপি একাই দখল করেছে ৭০টি পঞ্চায়েত সমিতি। আর কংগ্রেস ও জনতা দল (সেকুলার) কম-বেশি ৩০টা করে পঞ্চায়েত সমিতি জয়লাভ করেছে। অন্ততঃপক্ষে চল্লিশটি পঞ্চায়েত সমিতির ফলাফল ত্রিশঙ্কু। এই অপ্রত্যাশিত জয়ে রীতিমতো উল্লসিত বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ রাজ্যের বিজেপি-নেতৃত্ব মনে করছেন, তাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বিশেষ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাত্রা বিরোধীরা এতটাই উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়েছিল যে ভোটে এর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু বিরোধীদের যাবতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে রাজ্যবাসী রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বিজেপি-রাজের সূচনা করলেন। যে কারণে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব এই জয়ের পুরো কৃতিত্বটাই দিয়েছেন রাজ্যের মানুষকে।

গল্প

১২ই জানুয়ারী

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

জানুয়ারী মাসে এবার শীতটা খুব জাঁকিয়ে পড়েছে। শিল্পা বেশ বেলা করেই উঠলো। সাড়ে নটা বাজে। রাজ যথারীতি মর্নিংওয়াক সেরে ফিরে এসেছে।

ভগবতীদেবী তখনো পুজোর ঘরে। তাঁর বয়স হয়েছে। কিন্তু রোজ সকালে চণ্ডীপাঠ তাঁর করা চাই-ই।

ওনার স্বামী ভবতোষবাবু গত হয়েছেন প্রায় বছর চারেক। তারপর থেকে পূজা-আর্চা নিয়ে ওনার সময় কাটে। দুবেলা ঠাকুরের সামনে বসে ছেলে বৌ-এর মঙ্গল কামনা করেন। যদিও তা নিয়ে তাদের কোনও মাথা ব্যাথা আছে বলে মনে হয় না। তারা অত্যাধুনিক শ্রেণীর মানুষ। রাজ মেতে আছে তার চাকরি, প্রোমোশন, আর টাকার হিসেব নিয়ে। আর শিল্পা কিটি পার্টি আর মার্কেটিং নিয়ে।

রাজ ফলের রসে চুমুক দিয়ে দেখলো গাউনের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে শিল্পা শোবার ঘর থেকে বেরোলো।

—হাই হানি। গুডমর্নিং।

—মর্নিং ডিয়ার।

শিল্পা এবার জিজ্ঞেস করে, তোমার ব্রেকফাস্ট রেডী?

—কি করে হবে? তুমি তো এই উঠলে।

—কেন মা কি করছে? ও ঠাকুর ঘরে নিশ্চয়ই। যত্তসব রাবিশ।

রাজ বলে, আস্তে বল শুনলে দুঃখ পাবে।

শিল্পা ঝাঁকিয়ে ওঠে, পাক দুঃখ। যতসব বোগাস ব্যাপারে সময় দিতে পারে, আর তোমার ব্রেকফাস্ট-তৈরি করতে পারে না।

রাজ কাঁধ ঝাকিয়ে বলে, কি করবে, সেকেলে মানুষ।

দাঁড়াও বাথরুম থেকে ঘুরে-আসি, তারপর তোমার খাবার রেডী করছি। এই বলে শিল্পা বাথরুমে ঢুকে গেল।

রাজ সেদিনকার ইংরাজী খবরের কাগজটা নিয়ে একটি চেয়ারে বসে পড়লো।

গতকালের একটা রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে পড়েছিলো সে। হুঁস ফিরলো মায়ের ডাকে।

—খোকা প্রসাদটা নে।

রাজ বিরক্ত হয়ে বলে, এই একটা গুজিয়া না খাইয়ে আমার ব্রেকফাস্টটা-তো তৈরি করলে পারতে।

—তোর খাবারটাতো তোর বৌ তৈরি করতে পারে। তোরা তো জানিস সকালে এই সময়টা আমি পুজোর ঘরে থাকি।

—রাজ বিরক্তের সঙ্গে বলে, তুমি তো জান কাল শিল্পা পার্টি থেকে দেরী করে ফিরেছে। সকালে উঠবে কি করে? আর ওসব পুজোটুজো করে কিছু হয় না মা। এটা বিজ্ঞানের যুগ, মানুষ চাঁদে যাচ্ছে।

ভগবতী দেবী ভুঁরু কুঁচকে বললেন, তোদের অতোসব বিজ্ঞান-টিজ্ঞান জানি না বাপু। জন্মইস্তক দেখে আসছি মা-ঠাকুমাদের সংসারের মঙ্গলকামনায় পুজো করতে। হয়রে কিছু ফল হয়রে।

—রাখুন আপনার ওসব ফল।

চিৎকার করে ওঠে শিল্পা। কখন জানি সে দুজনের অলক্ষ্যে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে আবার চেঁচিয়ে ওঠে, যান না কিচেনে যান। ওসব গুজিয়াটুজিয়া রেখে ছেলের খাবারটা রেডী করুন। বাড়িতে কি দশটা দাসদাসী আছে?

রাজ কোনও সাড়া দেয় না। ভগবতী দেবী চোখের জল চাপতে চাপতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকেন।

—কি অলক্ষ্মী লেগেছে এই ঘরে। জানি না এর কি ফল।

দশটা নাগাদ অফিসের জন্য তৈরি হয়ে টাই ঠিক করতে করতে রাজ শিল্পাকে বলে, আজ সন্ধ্যেবেলা একবার স্বর্ণেন্দুদের বাড়িতে যাব। ইনভাইট করেছে।

শিল্পা আড় চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে আমরা দুজন নিশ্চয়ই? রাজ গম্ভীর ভাবে বলে, না মাকেও নিতে হবে। ওর মিসেস সোনালী আবার মার খুব ভক্ত কিনা।

—রাবিশ, শিল্পা বলে ওঠে। ওই আরেক গেঁইয়া ভূত। বললে নাও করা যায় না।

—এনি ওয়ে তৈরি থেকো, বলে রাজ অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

এই সময়টা শিল্পা পুরো একা। করার আর বিশেষ কিছু থাকে না। কি জানি বাড়িতে তখন ক'টা দাসদাসী থাকে।

মুখে একটা হাল্কা মেকাপের পোঁচ লাগিয়ে শিল্পা একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিন দেখতে থাকে। ফ্যাশানের হাল হকিকৎ সে এখান থেকেই পেয়ে থাকে।

ভগবতী দেবী কখন ঘরে এসে ঢুকেছেন সে টেরই পায়নি। বুঝলো ওনার গলার আওয়াজে।

—বৌমা ভাতটা চাপিয়ে দিয়েছি। আমি একটু সামনের মন্দিরে যাব, আজ বারো তারিখ...

শিল্পা পুরো না শুনেই ঝাঁকিয়ে ওঠে। বারো তারিখ তো কি হয়েছে। আ-আমি রান্নাঘরে যেতে পারবো না। আর তাছাড়া আমি একটু পরেই একবার বাবার কাছে যাব। ওসব রান্নাবান্না আপনি সামলান। আমি বিকেলে ফিরে আসব।

এবার ভগবতী দেবীর দিকে তাকিয়ে সুর করে বলে, আর আপনিও রেডি থাকবেন। আপনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোব।

আর কথা না বাড়িয়ে ভগবতী দেবী ঘর থেকে চলে যান। ড্রইংরুমে ঢুকে তার চোখ আটকে যায় দেওয়ালে টাঙানো স্বামীর বাঁধানো ছবির দিকে। ছল ছল চোখে মৃদুস্বরে বলেন, এই জন্য আমাকে রেখে চলে গেলে?

স্বর্ণেন্দুদের বাড়ি থেকে বেরোতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। রাজ নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলো। হঠাৎই শিল্পা বলে ওঠে, রাজ প্লিজ দাঁড়াও।

রাজ গাড়ীতে ব্রেক মারতে মারতে বলে, কি ব্যাপার?

শিল্পা গদগদ স্বরে বলে, পাশেই আইসক্রিম পার্লার ক্রস করে এল। আজ আইসক্রিম খাব।

—ও কে সুইটি, বলে রাজ রাস্তার পাশে গাড়ী দাঁড় করায়, শীতের রাতে তখন রাস্তা বেশ ফাঁকা। পার্লারও ফাঁকাই মনে হয়। মাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে দুজনে নেমে আইসক্রিম পার্লারের দিকে এগোচ্ছে, এই সময় পাশের পানের দোকানের সামনে থেকে দুটো চ্যাংড়া ছেলে টলতে টলতে এগিয়ে আসে। একজন অশ্লীল কথা বলতে বলতে শিল্পার হাত ধরে টানে। রাজ প্রতিবাদ করতে চায়, আরেকজন তাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে। শিল্পা প্রাণপণ চেঁচাতে থাকে হেল্প হেল্প। কেউ নেই চারধারে। এই ঝাপটা ঝাপটির মধ্যেই একজন ভোজালী বের করে ঢুকিয়ে দেয় রাজের পেটে, তারপর সবেগে অন্ধকারে দৌড় লাগায়।

ভালো করে বোঝার আগেই যেন সবকিছু ঘটে যায়। ভগবতী দেবী গাড়ি থেকে কোন মতে নেমে "খোকা" বলে রাজের কাছে দৌড়ে যান। রাজ তখন মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। গলগল করে অবিশ্রান্ত ধারায় রক্ত বেরোচ্ছে পেট থেকে। শিল্পা খালি রাজকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। ভগবতী দেবী কিছু করতে না পেরে কাঁদতে থাকেন। তিনি ঠিক কি করবেন কিছু বুঝতে পারেন না।

এইসময় অন্ধকার ফুঁড়ে দেবদূতের মতোই যেন সামনে এসে হাজির হয় কোনও এক সন্ন্যাসী। অন্ধকারে যা মনে হয় গায়ে গেরুয়া পোষাক, মাথায় পাগড়ী। তিনি তার ঝোলা থেকে ঝটপট কিছু বের করে রাজের ক্ষতে লাগিয়ে দিতে থাকেন। তারপর তিনি ভগবতী দেবীর দিকে ফিরে বলেন, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না মা। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন। আপনার ছেলে ঠিক হয়ে যাবে। সামনেই বাঁ পাশের গলিতে একটি নার্সিংহোম আছে, আমি একে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা আসুন।

এরপর সেই সন্ন্যাসী যেন অবলীলাক্রমে রাজকে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে হন হন করে হাঁটতে থাকেন। তার গতিবেগের সঙ্গে ভগবতী দেবী কেন, শিল্পাও পা মেলাতে পারে না।

তারা দুজন নার্সিংহোমে ঢুকে দেখেন রাজ একটি স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছে। বোধহয় পুরোপুরি অজ্ঞান। তাকে ঘিরে লোকজন ভিড় করেছে। তারমধ্যে একজন ডাক্তারও রয়েছেন।

শিল্পা ছুটে গিয়ে বলে, ডাক্তারবাবু উনি আমার হাজব্যান্ড। ওকে ছুরি মেরেছে। প্লীজ কিছু একটা করুন।

ডাক্তারবাবু বলেন, চিন্তা করবেন না, রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, এমারজেন্সীতে নিয়ে গিয়ে দেখছি।

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তবাবু ওদের দুজনকে ডেকে পাঠালেন। দুরু দুরু বুকে দুজন ডাক্তারের মুখোমুখি হলেন।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, ভয় নেই, উনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আধঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে। আগে কে চিকিৎসা করেছেন বলুন তো?

শিল্পা আমতা আমতা করে বলে, একজন সন্ন্যাসী কিসব লাগিয়ে দিলেন।

—সন্ন্যাসী! ডাক্তারবাবু বলেন, এনি ওয়ে কোনও কবিরাজী ওষুধ দিয়েছিলেন, আর সম্ভবত তাতেই রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেছিলো, না হলে কি হোত বলা যায় না। আরও আশ্চর্য এই যে যেভাবে ছুরিটা মারা হয়েছিল তাতে লিভার ড্যামেজ হওয়ার কথা। কিন্তু আপনার ভাগ্য ভালো মাসীমা, লিভার একদম ও কে।

ডাক্তারের চেম্বারের থেকে বেরিয়ে এলেন শ্বাশুড়ি ও বউমা। আজ রাতটা এখানেই থেকে যাবেন। হঠাৎ সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ায় ভগবতী দেবী এগিয়ে গেলেন গেটের দারোয়ানের কাছে।

—আচ্ছা ভাই, একটা কথা বলতে পারবেন?

—বলুন মাইজী, বলে দারোয়ানটি।

ভগবতী দেবী জিজ্ঞেস করেন, আমার ছেলেকে যে সন্ন্যাসী নিয়ে এলো সে কোথায় গেলো?

—কোই সন্ন্যাসীতো আয়া নেহী। এক গোড়া করকে প্যান্টশার্ট পরতা হুয়া নও জওয়ান কোলে করে নিয়ে এলেন।

বিস্মিত শিল্পা জিজ্ঞেস করে, তিনি এখন কোথায়?

—তা তো মালুম নেই মাইজী। আমরা পেসেন্টকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম;ও সাব কোথায় গেলেন, মালুম নেহী।

ভগবতী দেবী ধীর পায়ে হেঁটে করিডরের একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। তার চোখে মুখে রুদ্ধ আবেগ। শিল্পা তার পাশের চেয়ারে বসে বললো, সন্ন্যাসী তা হলে কোথায় গেল? এদিকে দারোয়ান বলছে প্যান্ট-শার্ট পরা যুবক। আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না। পাঁচ মিনিটে এসব কি হলো, ওরা কারা?

ভগবতী দেবীর দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। তিনি দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলেন, তাতো জানি না বৌমা, শুধু এইটুকু জানি। আজ বারোই জানুয়ারী—স্বামীজীর জন্মদিন।

একান্তে সাক্ষাৎকার : শংকর

‘স্বামীজী মানুষ থেকে মহামানুষ হয়েছেন, কোনও ঐশী শক্তির প্রভাবে নয়’

লেখক শংকর-এর সাম্প্রতিকতম কীর্তি ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’ নামক ৩৮৪ পাতা (৩২ পাতার রঙীন ছবিসহ)-র একটি গ্রন্থ-রচনা। দীর্ঘ ছ’বছর ধরে স্রেফ এই বইটিরই জন্য নিরন্তর গবেষণা করে শংকর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে করেছেন এক অমূল্য সংযোজন। তাঁর অননুকরণীয় ভাষা-শৈলীর সঙ্গে অমূল্য গবেষণা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইটিকে নিঃসন্দেহে করে তুলবে প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে স্থায়ী সম্পদ। লেখক সত্ত্বার পাশে গবেষক শংকরকেও খুঁজে বার করলেন স্বস্তিকা’র প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

❑ আপনি এর আগে একবার বলেছিলেন যে বাংলা-ই একমাত্র সাহিত্য যেখানে মৃতেরা রাজত্ব করে। কিন্তু ‘অচেনা অজানা বিবেকানন্দ’ কিংবা ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’— এই বইগুলোর বিচারে কি বলতে পারা যায় না যে ওই নিয়মের একমাত্র বর্তমান ব্যতিক্রম শংকর?

● না, না একেবারেই নয়। আপনি যদি প্রথম দশটা বেস্ট সেলার বই দেখেন তবে দেখবেন তার মধ্যেই আমারটা রয়েছে। এর বেশি কিছুনয়। তবে এর মধ্যেও একটা ব্যাপার রয়েছে। এটা আমার জন্যে যতটা না হচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাপারে জনমানসে আগ্রহের জন্যই এটা হচ্ছে।

❑ কিন্তু আপনার সাম্প্রতিকতম বই ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’-এর মুদ্রণসংখ্যাই যে ১ লক্ষ ৫ হাজার। এটাও তো একটা রেকর্ড?

● না, রেকর্ড সেভাবে বলা যাবে না। আগেও অনেক বই এরকম ছাপা হয়েছে। যেমন স্বামীজীর রচনাবলী, পত্রাবলী...। এইসব বইয়ের ধারে কাছে আমরা কোথায়? তবে বলা যেতে পারে আমাদের ভাগ্যটা ভাল যে তা সত্ত্বেও আমাদের বই বিক্রি হচ্ছে।

❑ তা ঠিক। তবে আকর গ্রন্থের মুদ্রণসংখ্যা বেশি হওয়াটা হয়তো সেরকম আশ্চর্যের নয়। কিন্তু অনুসন্ধানমূলক একটা গ্রন্থের এহেন মুদ্রণসংখ্যা বিস্ময়ের উদ্রেক করছে বই কি!

● জানি না। আমার মনে হয় না...।

❑ আপনি আপনার মা’র সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন যে তিনি ছোট জিনিসকে বড় করে ভাবতে শিখিয়েছিলেন। আপনার লেখা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রতিটি ছত্রে তার নমুনা পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এর জন্য আপনি আপনার সাহিত্য জীবনের গুরু শঙ্করীপ্রসাদ বসুকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন। এই দু’জনকে বাদ দিলে ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’ প্রকাশের মুহূর্তে আপনার ঠিক কার মুখটা প্রথম মনে পড়েছিল? আপনাকে তিনটি অপশন’ দিচ্ছি। প্রথম অপশন— আপনার বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয়ত, আপনার বিবেকানন্দ স্কুলের প্রধান মাস্টারমশাই সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, আর তৃতীয়ত, লক্ষ্মীমাধব মণ্ডল ওরফে ছেনোদা। যদিও এই শেষ নামটা কতটা প্রাসঙ্গিক হলো জানি না।

● হেডমাস্টারমশাই-ই আমাকে প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন। সুতরাং সময়ের দাবী মেনে সেই সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য-কে প্রথমে মনে পড়াটাই স্বাভাবিক।

❑ স্বামীজী এবং ঠাকুর-কে নিয়ে আপনার প্রকাশিত বইগুলো, বিশেষ করে এর সর্বশেষ সংস্করণ ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’;এখানে একটা আলাদা বিশেষত্ব আমাদের চোখে পড়ে এবং সেটা ছবির ব্যাপারে। বহু দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য ছবি আপনি বিবেকানন্দ অনুরাগীদের কাছে সহজলভ্য করে তুলেছেন। এই বিষয়টার কোনও ব্যাখ্যা দেবেন যে এর ফলে আমাদের স্বামীজী’কে চিনতে কতটা সুবিধে হয়েছে?

● সত্যি কথা বলতে কি বাংলা বইতে ছবি-কে একটু অবহেলার চোখেই দেখা হয়। কিংবা ছবি দিলেও তার ক্যাপসান দেওয়া হয় দায়সারা গোছের। কিন্তু প্রত্যেকটা ছবিরই আলাদা বিশেষত্ব আছে। কে তুলেছে, কবে তুলেছে, কোথায় তুলেছে— ছবি ছাপার ক্ষেত্রে এগুলোকে নিয়মের মধ্যে আনলে বলতেই হবে যে আমরা এটা করিনি। যখন যে কোনও ছবি-ই দিই না কেন, চেষ্টা করেছি সেই ছবিটুকু সম্পর্কে আমার যেটুকু জানা আছে তা দিয়ে দিতে। যেমন এবার আমার বইতে স্বামীজী’র পায়ের জুতোর ক’টা ছবি দিয়েছি। যার একটাকে দেখলে মনে হবে দুর্গম পথে, অরণ্যে, পর্বতে পরিব্রাজক স্বামীজীর পদযুগল যেন পৃথিবীর সমস্ত ধকল সহ্য করেছে। আবার আরেক জোড়া জুতোর ছবি দিয়েছি, যে খারাপ জুতো পরে স্বামীজী বিদেশে গিয়েছিলেন। ওই জুতো পরায় স্বামীজীর পায়ের অবস্থা এতই খারাপ হয়ে যায় যে তাঁকে এক লেডি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। যাকে ওদের দেশে ‘টো ডাক্তার’ বলা হয়। আমার মনে হয় এই ছবিগুলো পাঠকদের স্বামীজী-কে বুঝতে সাহায্য করবে। আমার বইতে অনেক ছবি পাবেন যেগুলো ইতিপূর্বে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অনেক ছবি আছে যেগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে যেমন মিস এফ হেনরিয়েটা মুলারের। এই ছবি আজকাল আর পাওয়া যায় না একথা বলবো না। তবে এখন বড় একটা কেউ ব্যবহার করেন না। স্বামীজী’র সঙ্গে এঁর মনোমালিন্য হয়। কিন্তু বেলুড় মঠে জমি কেনার জন্য দু’হাজর পাউন্ড অর্থসাহায্য ইনিই করেছিলেন। তাই স্বামীজীর সঙ্গে পরবর্তীকালে এঁর মনোমালিন্য হলেও এই ইতিহাসটা যেহেতু ভোলা যায় না তাই তাঁর ছবিও আমার বইতে ব্যবহার করেছি। তারপর একটা ছবি যোগাড় করতে আমার বেশ অসুবিধা হয়েছিল। সেটা হলো মাদাম মেরি লুই-এর ছবি। ইনিই প্রথম বিদেশিনী যাঁকে স্বামীজী প্রথম সন্ন্যাস দেন। সন্ন্যাসী জীবনে এঁর নাম হয় স্বামী অভয়ানন্দ। কিন্তু এঁর সঙ্গে ও স্বামীজী’র পরবর্তী জীবনে একটা দুঃখজনক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তাঁর ছবির একটা স্কেচ ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’ বইতে পাওয়া যাবে।

❑ আপনি এটাও বলেছিলেন যে কোনও মহাপুরুষের জীবনের বিভিন্ন খুঁটি-নাটি না

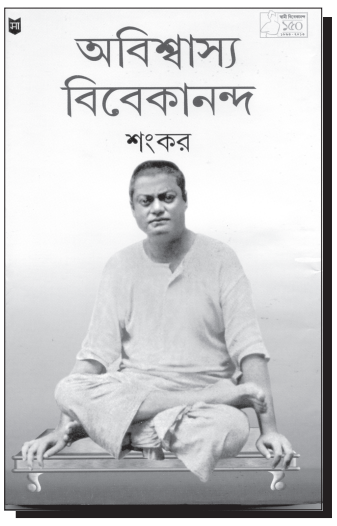

জানলে বা এদিক-ওদিক অনুসন্ধান না করলে সেই মহাপুরুষের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব হয় না। আপনার লেখা— ‘অচেনা অজানা বিবেকানন্দ’ এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত বিরচিত ‘সুলোচনা’ উপন্যাসের ভূমিকা-র কিছু চর্বিত-চর্বণ আমরা এই ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’ বইতে পেলাম। এটা কি এজন্যই হলো যে আমরা এই মহাজীবনকে জানার ব্যাপারে প্রায় সম্পৃক্ত অবস্থায় (saturated point) পৌঁছে গিয়েছি বলে? বিশেষ করে আপনার বইগুলোর পর স্বামীজী’র সম্পর্কে আর নতুন কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটন তো প্রায় অসাধ্যসাধনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

গু আমার তা মনে হয় না। স্বামীজী মারা যাবার পর তাঁর ইংরেজী জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন ডিসাইপলস্ বলে। লোকে ভাবল, যা বেরোবার তা বেরিয়ে গিয়েছে। স্বামীজী সম্পর্কে আর কিছু জানার নেই। এরপর নানা মানুষের স্মৃতিকথার ওপর ভিত্তি করে যখন বিভিন্ন বই রচিত হতে লাগলো, তখন আমরা দেখলাম এর থেকে অনেক নতুন বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। এরপরে মেরী লুইজ বার্ক প্রায় ত্রিশ বছর ধরে গবেষণা করে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর নিউ ডিজকভারিজ (স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট ঃ নিউ ডিজকভারিজ) লিখলেন। তিনি সেই বইতে এমন অনেক খবরা-খবর সরবরাহ করলেন যা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। এরপর গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সাতখণ্ডে লিখলেন ‘বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ’। তিনিও স্বামীজী-কে নিয়ে অনেক অজানা কথা আমাদের জানালেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু নতুন তথ্য সামনে আসছে। এই যে আপনি বললেন আর কিছু বেরোবে না, এটা আমার মনে হয় না। আমার কোথাও যেন একটা মনে হচ্ছে যে স্বামীজী-কে নিয়ে আরও অনেক কিছু আমাদের জানবার রয়েছে। ভবিষ্যতে গবেষকরা নিঃসন্দেহে তা উদ্ধার করবেন বলে আমার ধারণা।

❑ আপনি আপনার বইতে স্বামীজীকে শিক্ষক, নেতা, পরিত্রাতা, আধ্যাত্মিক ও সংগঠক বিবেকানন্দ হিসেবে তুলে ধরার পাশাপাশি বিড়ম্বিত স্বামীজীর একটা করুণ চিত্রও আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষ করে ‘অচেনা অজানা বিবেকানন্দ’ বইতে স্বামীজীর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে দিয়ে বাঙালী পাঠকের কাছে স্বামী বিবেকানন্দকে আপনার করে তুলেছেন। এর ব্যাখ্যাটা আপনার কাছে জানতে চাইব।

● সত্যি কথা বলতে কি আমি মনে করি যে এঁরা মানুষ থেকে মহামানুষ হয়েছেন। তা হয়েছেন যখন তখন এঁদেরও সাধারণ মানুষের মতো দু’টো হাত, দু’টো পা, একটা মাথা ছিল। নিজেদের প্রতিভাকে ব্যবহার করে এঁরা মহামানুষ হয়েছেন। আমি এটাই বলবো, কোনও ঐশী শক্তির প্রভাবে আকাশ থেকে হঠাৎ আলো পড়ে তাঁরা তৈরি হয়ে যাননি। এত সহজে তাঁরা পৃথিবী জয় করতে পারেননি। আমি পাঠকদের একটুই বলতে চাই যে এইসব মহামানুষদের দেবতার মতো শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু ‘দেবতা’দের সচরাচর যেসব সুযোগ-সুবিধে আমরা দিয়ে থাকি, যে তাঁরা অমর, তাঁদের শোক-তাপ নেই, তাঁরা অপরাজিত— এসব কিন্তু এঁদের জীবনে হয়নি।

❑ আপনি কি গানের সুরে এটাই বলতে চাইছেন— ‘দেবতা এদেশে মানুষ হয়েছে জানি, মানুষ দেখেছি গণদেবতার বেশে’।

● আমি কোনও গানের উদ্ধৃতি করতে চাই না। শুধু এটুকুই বলবো যে বিরাট বাধার মধ্যে দিয়ে এঁদের প্রকাশ, জগতের ইতিহাসে তা নিশ্চয়ই একটা বিস্ময় উদ্রেককারী ব্যাপার। সমকাল কিন্তু এদের প্রাপ্য কিছুই দেয়নি।

❑ আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাইব যে স্বামীজীর গায়ের রঙ কি ছিল, তাঁর উচ্চতা কত ছিল, দেহ-সৌষ্ঠব কেমন ছিল— এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তুলে ধরে স্বামীজী’র একটা রক্তমাংসের অবয়ব আপনি দিয়েছেন। অবশ্যই এর পেছনে আপনার একটা ভিন্ন মানসিকতা কাজ করেছে; দেবতা-সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় সেই মানসিকতা আপনার বক্তব্যকে নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। কিন্তু এই পরিকল্পনাটা আপনার মাথায় এল কি করে?

● বিদেশী লেখকদের লেখা যখনই আমি পড়েছি তখন দেখেছি ওঁরা প্রথমেই মানুষটার একটা ছবি এঁকে ফেলেন। যেমন মানুষটা কি রকম, তাঁর গায়ের রঙ কিরকম, চোখের চাহনী কিরকম, কত লম্বা, কত ওজন— এগুলো সহজেই ওরা মেপে নেয়। কিন্তু আমাদের এখানে তো এই ব্যাপারগুলো সেভাবে নেই...।

❑ আপনার এ নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা কি? পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীজী’র কোন্ দিকটা আলোকপাত করার পরিকল্পনা রয়েছে?

● দেখি আগে পাঠকরা কি বলেন! তাঁরা যদি ক্লান্ত হন, তো এনিয়ে আর...

❑ ধরুন পাঠকসমাজ সায় দিল যে ভোগবাদের এই চরম পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনকারী যুগেও শংকরের বই বহু মেধাবী ছাত্র-যুবককে ভোগের সাজানো নৈবেদ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। তখন কি করবেন?

● তাহলে আরও দু’একটা বিষয়, যেমন ধরো ‘ব্র্যান্ড’ নিয়ে কিছু কাজ করা যেতে পারে। যেমন, ‘ব্র্যান্ড বিবেকানন্দ’ আর ‘ব্র্যান্ড রামকৃষ্ণ’-এর মধ্যে কোনও তফাত আছে কি না। আমার সাধ্যে কতটা কুলোবে জানি না। তবে এটা নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করেছি। আরও কিছুটা করার চেষ্টা করবো।

রাহুলের জ্ঞানগম্যি

শ্রীরামমন্দির ও বাবরি ধাঁচা বিবাদে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মন্দিরের পক্ষে যে সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন তাঁর প্রেক্ষিতে সোনিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ধাঁচা ভঙ্গকারীদের শাস্তি দাবী করেছেন। শুধু তাই নয়, সোনিয়া-তনয় রাহুল মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে গোপনে বলেছে, Hindu Terror is more dangerous than that of Islamic terror। ৯।১১-তে আমেরিকার ট্রেড সেন্টার, ২৬।১১ মুম্বইয়ের তাজ হোটেল ধ্বংস করে নিরীহ দেশী-বিদেশী লোকেদের হত্যালীলা যারা ঘটিয়েছে, যারা পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণ করেছিল, গুজরাটে অক্ষরধাম মন্দির আক্রমণ করেছিল এবং এখনও গোয়েন্দারা ফটো স্কেচ জারি করে লস্কর-ই-তোইবা ও দেশী-বিদেশী ভয়ঙ্কর ইসলামী জঙ্গিদের আক্রমণ আশঙ্কা করছে, সেই অবস্থায় রাহুলের বক্তব্য কি দেশদ্রোহিতা নয়? ভারতের ৮০ শতাংশ হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিন্দু আতঙ্কবাদী বা গেরুয়া আতঙ্ক বলে কটাক্ষ যারা করছে, হিন্দুদের শত্রু ও ইসলামী ভয়ঙ্কর আতঙ্কবাদীদের বন্ধু সেজে ভারত রাষ্ট্র পরিচালনা করার দুঃসাহস তাদের হয় কি করে? মধ্যপ্রদেশ থেকে বিতাড়িত দিগ্বিজয় সিং-রা রাহুলদের যেসব ট্রেনিং দিচ্ছে তাতে সোনিয়া কংগ্রেসের ও রাহুলের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। যে গান্ধীর নামে আপনারা ভোট, নোট লাভ করছেন সেই মহাত্মা সারাজীবন "রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম" বলে গান গেয়েছেন। তিনি রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর আপনারা লুটেরা ইসলামিক শাসক কর্তৃক বিধবস্ত হিন্দুমন্দিরের উপর তৈরি কাঠামোর উৎপাটনকারীদের শাস্তির দাবী করছেন। লজ্জা করে না? হিন্দুরা কোনও মসজিদ ভাঙ্গে না। এ ধাঁচা ভেঙ্গে পড়েছে হিন্দুত্বের আবেগের কাছে। আপনাদের ক্ষমতা থাকে তো শাস্তি দেন। জাতীয় কংগ্রেস বহু পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং, সাধু সাবধান। সমস্ত হিন্দু সমাজকে এই তালিবানপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা।

টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি

এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল ভারতীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান আইনসভা বা সংসদ। গোটা শীতকালীন অধিবেশন (২৩ দিনের মধ্যে ২২ দিন) কোনওরূপ কাজকর্ম ছাড়াই শেষ হয়ে গেল। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এই অচলাবস্থা একটি 'কালো ঘটনা' রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। চিরকাল কংগ্রেসকে বইতে হবে সেই ঘটনার দায়।

সত্যি বলতে কী, স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি এমন এক কেলেঙ্কারি যা স্বাধীন ভারতে আর ঘটেনি। সরকারের অডিট সংস্থা সি এ জি (ক্যাগ) রিপোর্টেই প্রকাশ—টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে প্রায় পৌনে ২ লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে সরকারের। আর এই 'ক্যাগ' রিপোর্টেকে 'হটকেক'-এর ন্যায় লুফে নিয়ে বিরোধীরা টেলিকম মন্ত্রী এ রাজাকে বরখাস্ত এবং যৌথ সংসদীয় কমিটি (জে পি সি)-কে দিয়ে এই কেলেঙ্কারির তদন্তের দাবিতে হয়েছেন এককাট্টা। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে রাজা একা নন, আরও অনেক 'রাঘব-বোয়াল' জড়িত আছে— জড়িত সরকারের বহু কেষ্ট-বিষ্টু। বিপর্যস্ত সরকার রাজাকে বরখাস্ত করলেও জে পি সি তদন্তের দাবিকে মানা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। তারা এও জানিয়েছে যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পি এ সি)-কে দিয়ে তদন্তে রাজি। আর বিরোধীদের সন্দেহ এখানেই। কারণ পি এ সি সার্বিক তদন্ত করতে পারে না, কিন্তু জে পি সি পারে। এমনকী, জে পি সি প্রধানমন্ত্রীকেও জেরা করার অধিকারী। বিরোধীদের বিশ্বাস, 'কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়া'র ভয়ে সরকার জে পি সি তদন্তে নারাজ। অর্থাৎ 'ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়'!

আসলে সরকার এখন নিজেদের পাপ ঢাকতে বিজেপি-র দুর্নীতি নিয়ে হয়েছে সরব। কিন্তু তাদের এই প্রয়াস বা প্রতিহিংসা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ জনগণও সরকারের বিশেষ করে কংগ্রেসের এই প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে 'ঢিলের বদলে পাটকেল'-এর শামিল বলে মনে করছেন। উপরন্তু প্রায় পৌনে ২ লক্ষ কোটি টাকার স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি জনমনে কংগ্রেস ও তার শরিক দলগুলির সম্পর্কে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তবে জে পি সি গঠনের দাবিতে বিরোধীরা যেভাবে অনড় রয়েছেন তাতে স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি প্রচারে রাস্তায় নামলে এবং আগামী বাজেট অধিবেশনকেও তাঁরা অচল করে দিয়ে এক অকাল নির্বাচনকে ডেকে আনলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। এমনিতেই কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি, আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারি এবং টেলিকম কেলেঙ্কারি সরকার ও কংগ্রেসকে করেছে যথেষ্ট কলঙ্কিত। তার উপর অকাল নির্বাচন এলে কংগ্রেস যে মুখ থুবড়ে পড়বে তাতেও নেই কোনও সন্দেহ।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

উন্নয়ন না তোষণ?

অতি সম্প্রতি বিহারের ভোট-পর্বে এন ডি এ বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পরে যে কথাটি সর্বাগ্রে উঠে এসেছে তা হলো এটা কী হিন্দুত্বের থেকে উন্নয়নের জয়? স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় বিহারের উন্নয়নের কারিগর নীতিশকুমার প্রচারে নরেন্দ্র মোদীকে আসতে না দিয়ে উন্নয়নের চেয়ে হিন্দুত্বকে শুধু কম গুরুত্বই দেননি, বরং তাকে পিছনে ঠেলে দিয়েছেন। এবং এই জয় নিঃসন্দেহে তার উন্নয়নমুখী ইমেজকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশ যে ধর্মকে ছেড়ে উন্নয়নের প্রশ্নে আগ্রহী তার জন্য আমাদের সত্যিই গর্বিত হওয়া উচিত।

এবার চোখ ফেরানো যাক আমাদের রাজ্যে। এখানে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সুবিধা পাওয়াতে প্রধান দু'পক্ষই সমান তৎপর। একজন তাদের ও বি সি সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসেন তো অন্যজন রেলের পরীক্ষায় তাদের ফি মুকুব করেন। একজন দেশের অন্য কোনও সরকার মাদ্রাসা শিক্ষকদের মাইনে না দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেয় বলে বাহবা কুড়ান তো অন্যজন নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার জন্য নিজের পদবী বিসর্জন দেন বা হিজাব পরে নামাজ পড়তে যান। একজন মুসলিমবহুল এলাকায় থানায় মুসলিম ও সি নিয়োগ করেন তো অন্যজনের সাংসদ দেগঙ্গায় হিন্দু নিগ্রহে নেতৃত্ব দেন। অর্থাৎ মুসলিম তোষণে একে অন্যকে টেক্কা দেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অত্যাশ্চর্যজনক কোনও কিছু না ঘটলে আগামী ২০১১ নির্বাচনে অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষ জয়লাভ করবে না। আর বিরোধী বা সরকার কেউই এখন আর উন্নয়নের কথা বলেন না। তাদের মুখে শুধু সংখ্যালঘুদের জন্য কি কি করছেন তার বাণী। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে মূল ইস্যুটা কী? উন্নয়ন, শান্তি শৃঙ্খলা নাকি মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক? দাদা-দিদিরা কী বলেন? বিহারের লোক কি বাঙালীদের থেকে বেশি যুক্তিবাদী হয়ে গেল?

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

নব কু-গ্রহ শ্লোক

বায়সতুল্য রাজনীতিজ্ঞ সিদ্ধার্থ ধাড়ী ধুরন্ধরঃ।
অম্লান ক্লাব ইসলাম প্রেমী অশেষ পণ্ডিত-মূর্খঃ।।
সুনীল্লাঙ্গলী দুরাচার স্বামী প্রদানন্দ নির্বোধঃ।
শঙ্খমেঘ দেশত্যাগী তথাপি ইসলামভক্তঃ।।
সুকৃতি বিশ্বাসঘাতী সৌমিত্র দালাল যথা।
সুমন চট্টোঃ ইসলামায়িত বহ্বনারীগ্রাহী স্তথা।।
সুবোধ সরকারাশ্রয়ী লজ্জাহীন তল্পীবাহকঃ।
এতান নব কু-গ্রহাঃ জাতি-বৈরী দারুল-ইসলামকারকঃ।।
কুলাঙ্গার বেঙায়াশ্চাপি হিন্দুকুলক্ষয়কারী।
ভ্রমাদপি স্মরেৎ যদি কুম্ভীপাকেন সংশয়।।

—ইনসান বাঙাল।

বিশ্বায়নের যুগে নারীর মর্যাদা

পাঁচুগোপাল ঘোষ

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে নারীর মর্যাদা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যে কথাটা প্রথমেই মনে আসে সেটা হচ্ছে বিশ্বায়নের দৌলতে সত্যিই কি নারী আজ তার মর্যাদার আঙ্গিনায় উন্নত হতে পেরেছে? না তার মর্যাদা আরও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এটাই প্রধান বিচার্য বিষয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে আমরা দেখে আসছি যে পুরুষ মুখে যতোই বলুক না কেন কখনই সে নারীকে তার সমান অধিকার দিতে প্রস্তুত নয়। কারণ নারী সর্বদাই পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় উপেক্ষিত হয়ে আসছে। আজও সেই ট্র্যাডিশন যে সমানে চলেছে সে বিষয়ে এতোটুকু সন্দেহ নেই। পুরুষেরা সর্বদাই নারীকে তার ভোগের বস্তু ও দাসত্বের অধিকারের বেশি অধিকার দিতে রাজি নয়।

কোনও কোনও দেশে আবার নারীকে সম্পূর্ণ শাসিত গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের শিক্ষা ও বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অধার্মিক বলে বিবেচিত হয়। এমনকী তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারও খর্ব করা হয়েছে। এভাবে নারীকে কূপমণ্ডুক করে পুরুষেরা তাদের আপন পৌরুষত্বের প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। আর ঠিক সেই কারণেই কিছু সংখ্যক সহৃদয় পুরুষ তাদের পক্ষ অবলম্বন করে নারীকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করছেন। তাদের সমমর্যদা প্রদান করে বিশ্বের দরবারে দেখাতে চাইছেন যে নারীরা কোনও অংশে পুরুষদের অপেক্ষা কম নয়।

জনমত

যদি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি তাহলেই বুঝতে পারবো। আজ আমাদের অনেকেই সোচ্চার হচ্ছি যে বিশ্বায়নের ফলে নারী দিনের পর দিন তার নারীত্ব ও মাতৃত্ব হারাচ্ছে। কিন্তু যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব যে এর জন্য সত্যিই কি তাদের আমরা দায়ী করতে পারি। না, পারি না। এর জন্য সম্পূর্ণভাবে পুরুষেরাই দায়ী। তারা দাসী-বাঁদীদের মতো তাদের রাখতে চায়। তার বিরোধিতা করার অর্থ হলো— নয় তার মৃত্যু না হয় নির্বাসন। অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ। এই বিবাহ নামক শব্দটি আজ আর ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে এর একমাত্র অর্থ হলো উপভোগ্য যৌন সম্পর্ক ও সন্তান উৎপাদন। এর অর্থ— যে আদর্শ মাতা জায়া পারিবারিক সুসম্পর্ক স্থাপন দ্বারা সারা পরিবারকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখে সমাজের বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তার বিনাশ।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অনেকেই মনে করেন নারী আজ সমাজের অনেক উচ্চাসনে উন্নীত হয়েছেন। কারণ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতির যুগে তারা শিক্ষিত হয়ে সমাজের অনেক উচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা। কিন্তু আসলে কি তাই। তাহলে কেন আজও আমরা দেখতে পাই যে নারী ও পুরুষের মধ্যে ইগোর লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পুরুষের জয়ই নিশ্চিত। তাই আজও আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে বিশ্বায়নের যুগেও নারীর মর্যাদা তেমন বাড়েনি।

এখনও আমরা দেখতে পাই যে একজন মহিলা আই পি এস-এর অধীনে একজন পুরুষ ডেপুটি আই পি এস কাজ করতে শুধু অনিচ্ছুকই নয়, কিভাবে হেনস্থা করা যায় তার চেষ্টা করে। যদিও ওই মহিলা অফিসার তার যোগ্যতার বলেই উক্ত পদের অধিকারিণী।

তাই বলি কী, যদি সত্যই আমরা নারীদের সমান সম্মান দিতে চাই তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজের বুকে তাদের আদর্শকে তুলে ধরা ও তাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা। কারণ আমরা জানি পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি উন্নত ও শক্তিশালী তারা সকলেই নারী সম্মানের পক্ষপাতী। কোনও জাতিই নারীদের অসম্মান করে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ-শিষ্যা সিদ্ধি মাতা

নির্মল কর

তাঁর জীবনচরিত এবং সাধন-ভজন সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। কেন না, আশৈশব লৌকিক-জীবন এবং প্রতিষ্ঠার প্রতি তিনি ছিলেন বীতস্পৃহ। মানুষের স্তুতি-নিন্দা থেকে দূরে সমগ্র জীবন তিনি অতি নিভৃত সাধন-ভজনে অতিবাহিত করে স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিভাবে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠেন। সরলতা একাগ্রতা তন্ময়তা বৈরাগ্য এবং অব্যভিচারিণী নিষ্ঠায় ভগবানের দিকে প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্মুখ রাখতেন। সুদূর বৈরাগ্যের ওপর ভগবদ্ভক্তির সাহায্যে যিনি নিজের জীবন প্রতিষ্ঠা করেন, সাধারণের কাছে তাঁর পরিচিত ছিল সিদ্ধি মাতা নামে।

সিদ্ধি মাতার জন্ম নদীয়া জেলায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে। আসল নাম কাত্যায়ণী। পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। মাতা শ্যামসুন্দরী ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির। বাল্যকালে মায়ের কাছে পাওয়া শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ করে আট বছর বয়সে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পান। অল্প বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেও সিদ্ধি মাতা সাধারণ গৃহীদের মতো সংসারধর্ম পালন করেননি। স্বামী কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন আধ্যাত্মিক অনুরাগী-সম্পন্ন সৎ ব্রাহ্মণ। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কুলগুরুর সাহায্যে অধ্যাত্মমার্গে প্রবিষ্ট হন। তাঁর চিন্তার গতি স্বভাবতই অন্তর্মুখী ছিল বলে অনেক সময় অন্তর থেকে দিব্যবাণী পেতেন। সাধনার ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে নানারকম অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে। কিন্তু তিনি কখনও কোনও অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ করেননি। কারণ, তিনি বলতেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আত্ম-সাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ সহস্র চেষ্টা করেও নিয়তিকে লঙ্ঘন করা যায় না'।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন, 'সিদ্ধি মাতা বিশ শতকে বারাণসীর মতো জায়গায় অবস্থান করেও প্রাচীন দেশ ও যুগেরই যেন অধিবাসী ছিলেন। বর্তমান সভ্যতার আড়ম্বর ও জীবন-প্রবাহ তাঁর

পরম্পরা

অজ্ঞাত ছিল। তিনি ছিলেন ভক্তিপথের পথিক। সিদ্ধি মাতা বলতেন, 'সাধনার আগেও ভক্তি, অন্তেও ভক্তি—ভক্তিই সাধনার প্রাণ। জ্ঞান, মহাজ্ঞান প্রভৃতি তিনি পূর্ণরূপে আয়ত্তে এনেছিলেন', উপনীত হয়েছিলেন অদ্বৈত ভূমিতে। তিনি ছিলেন ভক্ত, যোগী ছিলেন না। বাল্যাবস্থা থেকে স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিভাবে সিদ্ধ ছিলেন।'

সিদ্ধি মাতা ১৩১৪-৪৬ এই বত্রিশ বছরকাল কাশীতে সাধনা করেন। তাঁর সাধনা ও পূজাপদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। যখন ভাবে বিভোর থাকতেন, তখন নিজের বুকের ওপর বীজমন্ত্র এঁকে চোখের সামনে কুশি ধরে তাতে চোখের জল সঞ্চয় করতেন এবং তাই দিয়ে পুজো করতেন। একাদিক্রমে পাঁচ ছ'দিন একাসনে বসে গভীর তন্ময়তায় সমাধিস্থ হতেন। আহার-নিদ্রার বালাই ছিল না। শয্যাগ্রহণ করতে কেউ তাঁকে দেখেনি। এপ্রসঙ্গে সিদ্ধি মাতা বলতেন, 'শরীরের জন্য বাহ্য-পদার্থের প্রয়োজন কী?' তিনি সর্বাবস্থায় আপাদমস্তক বিশাল অবগুণ্ঠনে আবৃত রাখতেন। প্রশ্নের জবাব দিতেন কদাচিৎ। শাস্ত্রাভিজ্ঞা না হলেও সুদীর্ঘ সাধনার ফলে ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। শাস্ত্রের উপদেশ, মহাজনগণের নির্দেশ বা জ্ঞানবৃদ্ধদের অনুশাসন তিনি মানতেন না। সাধুসঙ্গও করেননি। ঠাকুরই ছিল একাধারে তাঁর ইষ্ট ও গুরু। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। লাভ করেন জ্ঞান ও যোগশিক্ষা। এই সময়েই সিদ্ধি মাতার জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কাশীতে তিনি যখন বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, বিশালাক্ষী, চতুঃষষ্ঠী-যোগিনী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ প্রমুখ ঠাকুর দর্শন করতেন, সেইসব পাষাণমূর্তি তখন তাঁর চোখে চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হতেন। দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করে তিনি গভীর তন্ময়তায় সমাধিস্থ হতেন। ধ্যানস্থ থাকাকালীন সর্বতীর্থ তাঁর সামনে উপস্থিত হোত।

সিদ্ধি মাতা যেসব সাধনা করেছেন, সেসব বিষয় ক্রমে কায়াভেদ করে বাণীরূপে প্রকাশিত হোত। কায়াভেদী বাণীর সঙ্গে সঙ্গে দেব-দেবীদের মন্ত্র ও গায়ত্রী ফুটে উঠত। তাঁর ললাটে কখনও ওঙ্কার কখনও বা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। দেহে প্রকাশিত হোত বিষ্ণুপাদপদ্ম। বিষ্ণুর পরমপদ অতি দুর্গম এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদেরও দুরারাধ্য বস্তু। জগতের মলিন জীবকুলকে উদ্ধারের জন্যই তাঁর কায়াভেদ করে পরমপদে প্রকাশ। বহু সাধকভক্ত সিদ্ধি মাতার কায়াভেদী দেবদেবীর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন তারই সুযোগ্য শিষ্য শ্রীঅভয়, যিনি মানুষকে বললেন, 'কুলুঙ্গিতে নানা দেবতার পুজো নয়। কেন না, তা হবে নিছক খণ্ডের উপাসনা। সেই পরমের উপাসনা বোধে যে-উপাসনা, তাই হবে পূর্ণের আরাধনা। জীবনের সবচেয়ে বড় আসনটিতে সত্যকে অধিষ্ঠান করতে হবে। কারণ, সত্য এমন এক জিনিষ, যার সর্বোচ্চ বিকাশই ভগবানের পরম উপলব্ধি।' এসবই সিদ্ধি মাতার কথা।

সিদ্ধি মাতা দীর্ঘ-সাধন ব্যাপারে যে-পরিমাণ দৈহিক কষ্ট ও কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, সাধকদের জীবনের ইতিহাসে তা বিরল। সিদ্ধি মাতা বলতেন, 'সাধনার পথ অতি দীর্ঘ ও বিশাল। আত্মদর্শন, নিত্যলীলা, মহামিলন এবং ব্রহ্মলাভ হলেও সাধনা শেষ হয় না। কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ থেকে প্রকৃত সাধনার সূত্রপাত। মনুষ্য দেহধারী প্রতিটি জীবের মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত আছে। এই শক্তিকে জাগাতে না পারলে যা কিছু অনুষ্ঠিত হোক্ না কেন, তা অল্পাধিক পরিমাণে বাহ্যব্যাপারে পর্যবসিত হবে। সাধনার উদ্দেশ্য মৃত্যুর পর স্বর্গে আরোহণ নয়। শিবত্ব যে-সাধনায় জীব মোহনিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে আপন শিবত্ব অনুভব করে পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হতে না পারে, তা প্রকৃত সাধনা নয়।' সিদ্ধি মাতা আরও বলতেন, ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যে। মিথ্যের জন্য আগ্রহ বলেই মানুষের এত দুঃখ। আত্মসুখের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে নেই। সুখের আশা নিয়ে সাধনা করলে বা ভক্তি ছাড়া নাম করলে কার্যসিদ্ধি হয় না। মনকে সব সময় সংসার থেকে স্বতন্ত্র রাখা উচিত। বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে বিষয়ের জ্বালা যায় না। তেলের ধারার মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে।

এমনি করে ত্রিতাপদগ্ধ মানুষকে ঊর্ধ্বমুখী করার নিরলস সাধনায় মগ্ন অবস্থায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ কাশীধামে সিদ্ধি মাতা মরদেহ ত্যাগ করেন। অন্তিম সময়ে তাঁর বুকে ও ঠোঁটে বড় আকারে ওঁকার ফুটে উঠেছিল, শ্রীচরণ থেকে বিকশিত হয়েছিল রক্তবর্ণ জ্যোতি। কাশীর সিদ্ধি মাতার আশ্রমে আজও বহু সাধক সংগ্রহ করে চলেছেন তাঁদের সাধন পথের কড়ি। অমৃতপথের সন্ধানে ভীরু সশ্রদ্ধ পদসঞ্চারও ঘটছে বহু ভক্তের।

তব কথামৃত

'রত্ন' মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

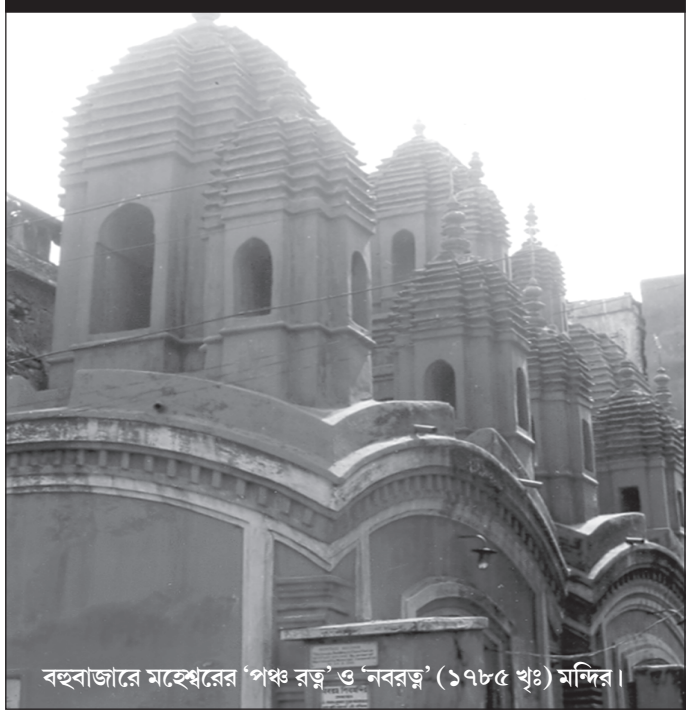

বহুবাজারে মহেশ্বরের 'পঞ্চ রত্ন' ও 'নবরত্ন' (১৭৮৫ খৃঃ) মন্দির।

ডঃ প্রণব রায়

আগের আলোচনায় দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠের উল্লেখ করা হলেও এদের কাছাকাছি আর একটি প্রসিদ্ধ মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি হলো 'মহামিলন মঠ'। ঠাকুর শ্রীসীতারাম দাস ওঁঙ্কারনাথ প্রতিষ্ঠিত রাধাশ্যামজিউ দেউলমন্দির এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। মন্দির আধুনিক হলেও এর শিখরটি সুদৃশ্য এবং সংলগ্ন প্রশস্ত দর্শকমণ্ডপে প্রতিদিন বহু ভক্ত উপস্থিত হন। রাধাশ্যামের ও রাধিকার বৃহদাকার মূর্তির সঙ্গে ললিতা বিশাখা প্রভৃতি অষ্টসখীর মূর্তিও এখানে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিদিন ভোগ আরতি হয় এবং ভক্তগণ প্রসাদ পান। সম্প্রতি ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুরের মূর্তি নবনির্মিত একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানের মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি বহু ভক্তকে আকর্ষণ করে।

গঙ্গার সন্নিকটবর্তী পূর্ব আলোচিত প্রাচীন ও নবনির্মিত মন্দিরগুলির স্থাপত্যে অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই, ইঁটের তৈরি হলেও টেরাকোটা অলঙ্কারও অনুপস্থিত। বেশির ভাগ মন্দিরই 'আটচালা'-রীতির। অল্পকিছু 'পঞ্চ রত্ন' বা 'নবরত্ন' সাদামাটা মন্দির কোলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে বর্তমান। মন্দির দেওয়ালে মূর্তি অলংকরণ ও কারুকার্য খুবই বিরল। পক্ষান্তরে, পশ্চিমবাংলায় বহু প্রত্যন্ত গ্রামে অগণিত মন্দিরের মধ্যে এমন অনেক মন্দির আছে যেখানে টেরাকোটা অলংকরণ ও প্রস্তর ভাস্কর্য শিল্পরসিকদের খুবই আকর্ষণ করে। কোলকাতার বহু মন্দিরে এগুলির অভাব আমাদের বিস্ময়ান্বিত করে।

গ্রামগ্রামান্তরের মন্দিরগুলির প্রসঙ্গে আসার আগে কোলকাতার আরও কয়েকটি মন্দিরের আলোচনা প্রয়োজন। অল্পপরিচিত ও প্রায় অজ্ঞাত একত্রে তিনটি 'রত্ন' মন্দির বহুবাজার এলাকার কেনডারডাইন লেনে অবস্থিত। মন্দির তিনটি মহেশ্বর শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। কোলকাতার 'রত্ন' মন্দিরের সংখ্যা যেখানে খুবই কম, সেখানে খৃস্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে তৈরি পাশাপাশি এই তিনটি 'রত্ন' মন্দির খুবই আকর্ষণীয়। তিনটি মন্দিরেই বিশাল তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এরূপ বৃহৎ কালো (ব্ল্যাক বেসল্ট) পাথরের শিবলিঙ্গ কোলকাতার ভূকৈলাসেও দেখা যায় এবং 'শিবনিবাসে' (নদীয়া) লক্ষ্য করা যায়। এখানের শিবলিঙ্গ অবশ্য ভূকৈলাসের থেকে কিছুটা পৃথক্ ধরনের। মন্দির ইটের তৈরি, দক্ষিণমুখী। প্রথমটি 'পঞ্চ রত্ন', দ্বিতীয়টি 'নবরত্ন' এবং তৃতীয়টি 'পঞ্চ রত্ন' রীতির। কিন্তু মন্দিরগাত্রে কোনও টেরাকোটা অলংকরণ নেই।

তবে, স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মন্দির তিনটি কম আকর্ষণীয় নয়। বাঁকানো ফার্নিশযুক্ত নিচের 'চালা'র ছাদের ওপর 'রত্ন'গুলি অবস্থিত।

মন্দিরে প্রাচীন কোনও লিপি নেই। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে স্থাপিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি লিপি থেকে জানা যায়, ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে সেসময়ে ইংরেজদের দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকড়াশি এই মন্দির স্থাপন করেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন পাকড়াশির বংশধর। বর্তমানে এটি কোলকাতার 'হেরিটেজ বিলডিং'-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

হ্যাম রেডিও হয়ে উঠতে পারে উপার্জনের হাতিয়ার

নীল উপাধ্যায়

অত্যাধুনিক বা সফিস্টিকেটেড মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবস্থাও যখন ভেঙে পড়ে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কিংবা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে বন্ধ রাখতে হয়, তখন কিন্তু ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সহায়ক উপাদান হয়ে ওঠে বহু প্রাচীনকালের সখের কমিউনিকেশন সিস্টেম। হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের, এমনকী মহাকাশযানের অভিযাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলা যায়। এর জন্য আলাদা কোনও প্রচার লাগে না। রেডিওর মতো হ্যামেদের বেস-স্টেশন থাকে। হ্যামের গতি সর্বত্র। এই ব্যবস্থায় বিনা তারে অ্যান্টেনার মাধ্যমে খবরের আদান-প্রদান হয়। হ্যামের নিজস্ব ভাষা আছে যাকে বলে Morse-1–Morsekey-র সাহায্যে বাজাতে হয়। সীমান্তরক্ষীবাহিনী, ট্রাফিক পুলিশ, মৎস্যজীবীদের হ্যাম রেডিওর ব্যবহার বেশি।

যোগ্যতা ঃ হ্যামরেডিও অপারেটর হতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রকের ওয়্যারলেস প্ল্যানিং অ্যান্ড কো অর্ডিনেটিং উয়িংস' থেকে লাইলেন্স নিতে হয়। লাইসেন্স পেতে হলে পরীক্ষা দিতে হয়। ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশনে আগ্রহ থাকলে যে-কেউ এই পরীক্ষা দিতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স এক্ষেত্রে কোনও বাধা সৃষ্টি করে না।

পরীক্ষার বিষয় ঃ (১) ইলেকট্রনিক্স-এ প্রাথমিক জ্ঞান (২) মড কোড। ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশনের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে পারলে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধে। এ ব্যাপারে যোগাযোগের ঠিকানা 'ইন্ডিয়ান ওয়েভ অব্ অ্যামেচার রেডিও' ছত্বট্বত্মগ্ন, ৬০, নিউ জি টি রোড, উত্তরপাড়া, হুগলি। রাজ্যে এই বিষয়ের একমাত্র স্বীকৃত চ্বট্বত্ম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। কোর্স ৪ মাসের, সপ্তাহে ২ দিন। শনিবার বিকেল ৩—৫টা। রবিবার সকাল ১০—১২টা। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে। পাশ করলে ১০ বছরের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়।

কাজের সুযোগ ঃ আমেচার স্টেশন অপারেটিং-এর সার্টিফিকেট থাকলে রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের টেকনিক্যাল পদে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে, পুলিশ ফোর্সের টেলিকমিউনিকেশনে, আর দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন কাজে সুযোগ পাওয়া যাবে।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ২১

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

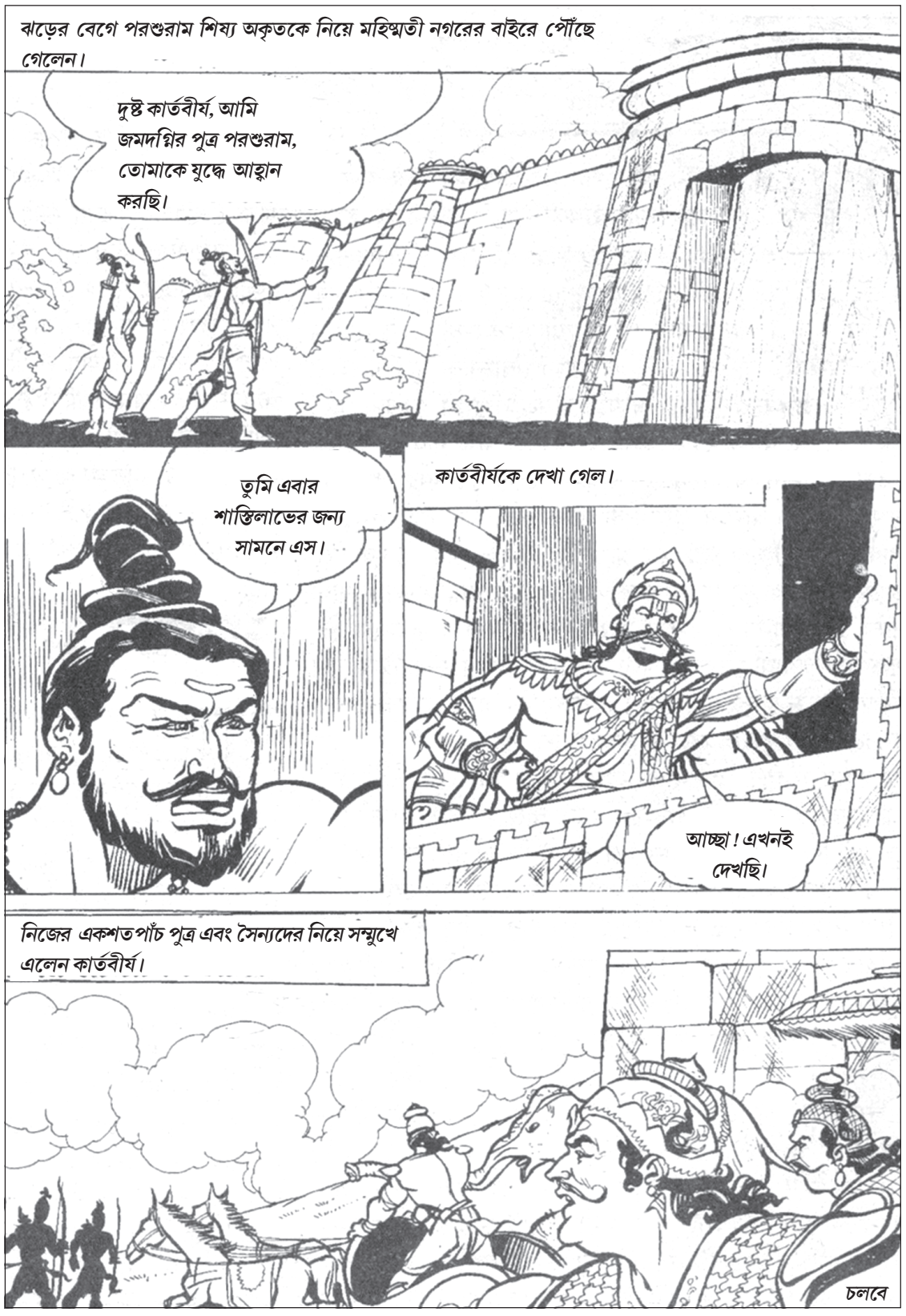

।। নির্মল কর।।

নিঃশ্বাস বায়ু নিলামে

একটা বয়ামে ধরে রাখা হয়েছিল হলিউডের তারকা-দম্পতি ব্রাডপিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ছাড়া-নিঃশ্বাস বায়ু। সম্প্রতি ৫২৩ ডলার মূল্যে নিলামে বিক্রি হলো সেই তারকা নিঃশ্বাসে-পূর্ণ বয়াম।

অনলাইনে দুধওয়ালি

ছাবিবশ বছর বয়সী বৃটিশ সিঙ্গল-মাদার টেনি এব্ডন তাঁর শিশু সন্তান ডেভিডকে স্তন্যদানের পর উদ্বৃত্ত স্তন্যদুগ্ধ বিক্রি করে দেন। ১৫ পাউন্ডের বিনিময়ে ৪ আউন্স বুকের দুধ কেনেন নিয়মিত অন্তত ১০ জন। এই সদ্য-জননী এক ফোঁটা দুধও অপচয়ে রাজি নন।

চুম্বনের ঠেলায়

আদমের আপেলে কামড় বসিয়ে কম পস্তায়নি ইভ। এবার নতুন ঝঞ্ঝাট ইংল্যাণ্ডের বেডফোর্ডশায়ারে। ঘটনা চুম্বন-ঘটিত। চৌদ্দ বছরের লরা কুকিকে'র, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে চুম্বনের পরেই, এলার্জির কবলে পড়ে প্রাণ যায় আর কি! লরার বাদামে এলার্জি। বয়ফ্রেন্ড তো বাদাম চিবিয়ে বেশ করে খেয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। স্কুলে অসুস্থতার কারণ হিসেবে ফর্মে লেখা হয়েছে 'বয়ফ্রেন্ড কিস্‌ড'।

দশদিনের জ্যাম

চীনের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। পৃথিবীর বৃহত্তম জনবহুল গাড়ি-বহুল বেজিং-তিব্বত হাইওয়ের ১০০ কিমি জুড়ে টানা ১০ দিন দাঁড়িয়ে ছিল সার সার গাড়ি, ট্রাক ইত্যাদি। জন-সংখ্যার পাশাপাশি দীর্ঘতম যানজটের রেকর্ডটিও এবার চীনের দখলে।

নাম মাহাত্ম্য

মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পুরো নাম তাঁর গুণ ও কর্মজাত। মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ও অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধার গর্ভে দ্বাপর যুগে এই মহামনীষী ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রতিভার জন্ম। একটি দ্বীপের ওপর জন্মের কারণে তাঁর নাম দ্বৈপায়ন এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ। ইনিই সর্বপ্রথম বেদের সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং বিভাগ করেন বলে তাঁর অপর নাম বেদব্যাস।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

প্রশ্ন ঃ কোন্ আয়নার দিকে তাকালে এক সময় অনেক খবর পাওয়া যেত?

উত্তর ঃ সমাচার দর্পণ।

* * *

রমেনবাবু ঃ আপনার সঙ্গে প্রতি শনিবারেই ডাক্তারবাবুর ওয়েটিংরুমে দেখা হয়, গত শনিবার যাননি কেন?

সোমেনবাবু ঃ শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না।

* * *

শিক্ষক ঃ তাহলে তোমরা শিখলে জল দেয় যে জলদ, আর কর দেয় যে করদ। এরকম আরও দুটি উদাহরণ দিতে পার?

এক ছাত্র ঃ হ্যাঁ স্যার। বল দেয় যে বলদ, আর মরতে জানে যে মরদ।

* * *

গীতা ঃ বল্ তো, ডিম আগে না মুরগি আগে?

রীতা ঃ ডিমই আগে। আমরা ব্রেকফাস্টে ডিম খাই, লাঞ্চে মুরগি।

* * *

বাবা ঃ তুমি এবছর ফেল করলে কেন পাপান?

ছেলে ঃ তোমাকে নতুন বই কিনতে হবে বলে মাস্টারমশাইরা আমাকে পাশ করাননি।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। মহিলা নন, কিন্তু মহিলা ছদ্মনামে লিখে 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছিলেন কে?

২। মহাভারতের চরিত্র, যিনি একশো ভাইয়ের একমাত্র বোন, যাঁর স্বামীর নাম জয়দ্রথ। কে তিনি?

৩। মার্কিন ১ ডলার নোটে কোন্ প্রেসিডেন্টের ছবি থাকে?

৪। কী বিক্রি করে ভারত সব থেকে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে? —চা/বাগ্‌দা চিংড়ি/চিনি।

৫। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' কী নামে এবং কোথা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (অনিলা দেবী)

২। দুঃশলা

৩। জর্জ ওয়াশিংটন

৪। চা

৫। ইন্ডিয়া সোসাইটি অব লন্ডন থেকে, ১৯১২ সালে

সমাবেশ সমাচার

ইন্টারন্যাশানাল মিশনের সচেতনতা শিবির

দ্য ইন্টারন্যাশানাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটির উদ্যোগে গত ২০ ও ২২ নভেম্বর অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে 'প্রতিবেশী রাষ্ট্র সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নারী এবং শিশু পাচার প্রতিরোধ, সচেতনতা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা প্রতিরোধ সচেতনতা শিবির' আয়োজিত হলো। ২০ নভেম্বর অসমের ধুবড়ি জেলার শালকোচা গ্রামে এবং বঙ্গাইগাঁও জেলার ধানতোলা গ্রামে, ২১ নভেম্বর অসমের গোলাঘাট জেলার বোকাখাত ও দেরগাঁও গ্রামে এবং ২২ নভেম্বর এরাজ্যের কোচবিহার জেলার শালবাড়ি ও দেওয়ানহাট-এ এই ধরনের শিবির আয়োজিত হয়। তিনদিন বিভিন্ন শিবিরে ৯২৫ জন নারী-শিশু ও বৃদ্ধরা অংশগ্রহণ করেন।

বক্তব্য রাখছেন অদ্বৈত চরণ দত্ত।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবা শিবির উদ্বোধন

পবিত্র শ্রীরামজন্মভূমিকে কোনও ভাগাভাগি করা চলবে না। শ্রীরামচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্য কারও কোনও উপাসনাস্থলও হবে না। এভাবেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য শিবিরের উদ্বোধনে বক্তব্য রাখেন পরিষদের বিভিন্ন নেতা ও সাধু সন্ন্যাসীবৃন্দ। প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১০ জানুয়ারি আউটরাম ঘাটের নিকটে মোহনবাগান মাঠের পিছনে তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপক বন্দোবস্ত করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা শাখা। অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে বিকেল চারটায় শিবিরের উদ্বোধন করেন বসিরহাট থেকে আগত ভক্তিদাস মহারাজ এবং অখিল ভারতীয় জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় কর্মকর্তা রামানুজ পরাশর মহারাজ।

প্রধান বক্তা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত ভারতবর্ষের সাধু-সন্তদেরকে সন্ত্রাসে জড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ জানান। পরিষদের সর্বভারতীয় সম্পাদক নন্দলাল লোহিয়া সমবেত সকলকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিবিধ সেবাকাজের বিষয়ে অবগত করান। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্টেন্ট মোহন পারেখ। সভা পরিচালনা করেন রামগোপাল সুঙ্গা। বহু পুণ্যার্থী এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

পূর্বাঞ্চলীয় বৈদিক সম্মেলন

সম্প্রতি মহর্ষি সন্দিপনী রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কলকাতার বরাহনগরে অবস্থিত মহামিলন মঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পূর্বাঞ্চলীয় বৈদিক সম্মেলন। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বহু বৈদিক পণ্ডিত এবং সংস্কৃতানুরাগী বিদগ্ধজনেরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপ কুমার কাঞ্জিলাল। ১৭ ডিসেম্বর সকালে সংসদের বিদ্যার্থীদের কণ্ঠে বৈদিক মঙ্গলাচারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এর উদ্বোধন করেন সংসদের সম্পাদক পণ্ডিত রামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ। আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী এবং ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরালভাই আশীর্বচন প্রদান করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ করুণাসিন্ধু দাস, পুরী জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নীলকণ্ঠপতি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদ বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত জনা-কয়েক অধ্যাপক যেমন ডঃ সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী, ডঃ সীতানাথ দে, ডঃ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন প্রণবানন্দ পল্লীতে বিষ্ণুপদ সরস্বতী শিশুমন্দিরে আচার্য-আচার্যাদের সরস্বতী বন্দনা ও রাজ্য সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পালের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা-সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অজিত ব্যানার্জী, রাজ্যসম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত, যুগ্ম-সম্পাদক অবনীভূষণ মণ্ডল, বাঁকুড়া জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক আশীষ মণ্ডল প্রমুখ। সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন নারায়ণ পাল।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সম্মেলন

গত ২৫ ডিসেম্বর বাঁকুড়া শহরের

অর্শ চিকিৎসা শিবির

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, সমাজসেবা ভারতী ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনায় যথাক্রমে গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ৪ দিনব্যাপী পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ার বলরামপুর, পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ঝিলিমিলি ও বেলপাহাড়ী-তে; গত ২৪ অক্টোবর ডায়মণ্ডহারবারে, ৮ নভেম্বর বহরমপুর পরিষদ ভবনে অর্শ চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়। ডঃ বি সি সাহা উক্ত শিবিরগুলিতে ইঞ্জেকশান পদ্ধতিতে রোগীদের চিকিৎসা করেন।

বর্ধমান প্রেসক্লাবের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ 'অতীতকে মনে রেখো'

দীপক গাঙ্গুলী ॥ তথ্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক নিবিড় থাকলেই তথ্যের প্রকৃত মর্মার্থ ফুটে উঠে বলে মন্তব্য করলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য ষোড়শী মোহন দাঁ। গত ২৯ ডিসেম্বর বিকালে বর্ধমান তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ডস্থিত লায়ন্স ক্লাবের সভাঘরে বর্ধমান প্রেসক্লাব আয়োজিত 'অতীতকে মনে রেখো' এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্ধমান প্রেস ক্লাবের সম্পাদক পার্থ চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকতার পেশাতে নিরন্তর সামাজিক দায়বদ্ধ তার বিষয় মাথায় রেখে তাকে ব্রত করে তুলতে হবে। বাহ্যিক লোভ-লালসার উপরে উঠে এই ব্রত পালনের অঙ্গীকার হলো প্রকৃত সাংবাদিকতা। এদিনের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পার্থ চৌধুরী বলেন, গণমাধ্যমের প্রতি দায়বদ্ধ তার পাশাপাশি গণমাধ্যমের কর্মীরা যাতে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই আয়োজন। পঁচাত্তরের জরুরী অবস্থার পর যে বা যারা একাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে তাদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন ও তাদের কীর্তি তুলে ধরাও অনুষ্ঠানের লক্ষ্য বলে পার্থবাবু মন্তব্য করেন। বর্ধমানের প্রয়াত সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এবং সদানন্দ দাস প্রমুখদের এদিন দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

স্মরণ সভা

গত ২৩ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় মালদা সঙ্ঘ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কালিদাস বসু ও বাংলার সঙ্ঘকার্যের অগ্রদূত মালদার সঙ্ঘ কাজের প্রথম দিককার স্বয়ংসেবক রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী) বদ্রীনারায়ণ দাসের স্মরণ সভা। স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘ চালক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী, মহকুমার সঙ্ঘ চালক সুধাংশু জ্যোতি রায় ও ইতিহাস সংকলন সমিতির উত্তরবঙ্গের প্রমুখ ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিদ্রোহী সরকার, নগর সঙ্ঘচালক সুভাষ কুমার দাস ও রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, বদ্রীনারায়ণ দাস (মামা)-এর পুত্র ডঃ প্রলয় কুমার দাস, ধর্মজাগরণ উত্তরবঙ্গের সভাপতি রাজেন্দ্রলাল লাহিড়ী মহাশয়।

গত ৬ জানুয়ারি কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের সীমাহীন আর্থিক দুর্নীতির প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রীট ও ধর্মতলা চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় বিদ্যার্থী পরিষদ। মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচীর মধ্যে ৫০০ ছাত্রছাত্রী একটি মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহানগরীর বিভিন্ন পথ-পরিক্রমা করে।

কল্যাণ আশ্রমের স্বাস্থ্যসেবা শিবির

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় দুই দিনের 'স্বাস্থ্যসেবা শিবির' গত ১, ২ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার চুনাখালি হাটখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সোনাখালি তেঁতুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়ে গেল। এই শিবিরে কলকাতা থেকে ৮ জন চিকিৎসক, ১৯ জন চিকিৎসা সহযোগী ও ২৭ জন সমিতি সদস্য—মোট ৫৪ জনের একটি দল গিয়েছিলেন। দুই দিনের শিবিরে মোট ১০৪৪ জনের চিকিৎসা করা হয়েছে। শিবিরে সাধারণ চিকিৎসা ও আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবস্থা ছিল। ৪০০ জন রোগীর চোখের শক্তি নির্ণয় করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে আগামী ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি নিঃশুল্ক চশমা দেওয়া হবে। দুটি শিবিরে মোট ৬১ গ্রাম থেকে অসুস্থ ব্যক্তিরা এই চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। এখানে যোগ এবং প্রাণায়াম শেখানোরও ব্যবস্থা ছিল।

বঙ্গম

‘শোকমিছিল’ নাটকে উঠে আসা প্রশ্ন

রাজনীতিতে আদর্শবাদ, মূল্যবোধ না দুর্বৃত্তায়ন ?

বিকাশ ভট্টাচার্য

সম্প্রতি একটি দৈনিকের প্রবন্ধে হেডলাইন ছিল এইরকম, “কমরেড থেকে হার্মাদ, এই গুণগত পরিবর্তনই এখন সিপিএমের পরিচয়”। প্রবন্ধের ভেতরে লেখক আরও লিখেছেন, পাড়ার প্রোমোটারদের দালাল কিংবা মস্তান তারাও শাসকদলে নাম লিখিয়েছে। তাদেরকেও বলে ‘কমরেড’। আজ আর মানুষ বিশ্বাস করে না, সিপিএম দলের সঙ্গে যুক্ত অথচ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। লেখাটা পড়তে পড়তে বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন আগে কলকাতার শিশিরমঞ্চে দেখা বালুরঘাট নাট্যচর্চার নাটক ‘শোক মিছিল’-এর কথা। নাটকটি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত কাহিনির সূত্র ধরে লেখা। নাট্যরূপ দিয়েছেন ২০০৯-১০-এ ভবেন্দু ভট্টাচার্য। নির্দেশনা ও প্রধান চরিত্র বিনয়ভূষণ-এর ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন তিনি।

নাট্যকাহিনি

‘শোকমিছিল’-এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি কমিউনিস্ট পরিবার যার কর্তা বিনয়ভূষণ। ১৯৬৭-৬৯-এর রাজনৈতিক অভিঘাত তোলপাড় করে তুলেছে পরিবারটিকে। একদিকে বিনয়ভূষণ, স্ত্রী পারুল এবং দুই যুবক পুত্র অজয় ও বিজয়। এই দম্পতি আদর্শগতভাবে দলীয় অনুশাসনে নিজেদের বেঁধে রাখলেও দলে রয়েছেনীহারদের মতো কমরেডরা। মতাদর্শ ও মূল্যবোধের চেয়েও ক্ষমতার ক্ষেত্রে নিজেদের স্থাপন করাই যাদের কাছে বড়। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নকে তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে (সেই ৭০-এর দশকেও !)। বিনয়ভূষণের স্ত্রী পারুল মেনে নিতে পারেন না এই ক্ষয় এবং আদর্শের অপমানকে। তিনি প্রতিবাদ করেন। পার্টি এঁদের বড়ছেলে অজয়কে দলের সদস্যপদ দিলেও ছোট ভাই-এর প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য তাকে পছন্দ করে না। বিজয় বেছে নেয় উগ্র রাজনীতির পথ। মনে পড়ে যায় সেই ৭০-এর দশকের চারু মজুমদারদের উগ্র রাজনীতির মোহে শিক্ষিত যুবকদের মোহগ্রস্থ করার রাজনীতি। যার ক্রমবর্ধমান ভয়ঙ্কররূপ আজও আমাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিষিয়ে রেখেছে।

নাটক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোয় যখন ছোটভাই বিজয় প্রতিক্রিয়াশীলদের শেষ করতে গিয়ে খতম করে বসে নিজের দাদাকে আর সেই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতে নিজেও খতম হয়। খতমের রাজনীতির শিকার হয় একই পরিবারের দুই ভাই। দুই সন্তানকে হারিয়ে আদর্শবাদী বিনয়ভূষণ নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে বসেন— রাজনীতিতে আদর্শবাদ না দুর্বৃত্তায়ন, কোনটি হবে আগামী দিনের পথ, আর অন্যদিকে পারুল সব তর্কের উর্দ্ধে উঠে রাজনীতির মানবিক মুখটি খুঁজে বেড়ান— যা ভারতীয় জীবনবোধের মূল কথা।

শোকমিছিল নাটকে অদিতি দাশগুপ্ত ও ভবেন্দু ভট্টাচার্য।

মার্কসবাদ না মানবতাবাদ

নাটকটি দেখার পর মনে হয়েছে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন ‘মার্কসবাদ’ সঠিক— শুধু তার রূপায়ণ করার দায়িত্বে যারা তারা দিগ্‌ভ্রান্ত। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদের মধ্যেই কি হত্যালীলার বীজ বপন করা নেই? যেখানে যেখানে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হয়েছে রক্তের হোলি খেলার মধ্যে দিয়ে। সেকথা ভুলে গিয়ে উগ্রপন্থীদের দোষারোপ করলে কি ‘মার্কসবাদ’ ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যাবে? আসল কথা মানবতাবাদ— যার নামগন্ধ নেই মার্কসবাদে। নতুন এতদেশে মার্কসবাদী সরকার গঠিত হয়েও কেন সাধারণ মানুষের কোনও উপকার করে উঠতে পারলো না?

তবু ‘শোকমিছিল’ ভালো লাগে বলিষ্ঠ লেখনীতে কম্যুনিস্টদের আদর্শহীনতার কথা বলেছে বলে। একসময় হর ভট্টাচার্যের ‘অদ্ভুত আঁধার’ নাটকে বিভাস চক্রবর্তী এইভাবে কমরেডদের আদর্শহীনতার কথা তুলে ধরেছিলেন। যে নাটক তাঁকে মাঝপথে বন্ধ করতে হয়। একইভাবে ব্রাত্য বসুর ‘উইংকিল টুইংকিল’ নাটকেও কমরেডদের তুলোধোনা করা হয়েছে। হালের ‘শৃঙ্খল কমরেডস্’ সেই দিকেই আলো ফেলেছে। আজ কমরেডরা নিজেরাই নিজেদের সমালোচনা করছেন। ভালো কথা। কিন্তু ৩৩ বছর অনেক সময়। এতো পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি শুধু সমালোচনায় হবে?

অভিনয়ের কথা

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই পারুলের ভূমিকায় অদিতি দাশগুপ্ত-র কথা সর্বাগ্রে বলতে হয়। নাট্যকার-নির্দেশক ও বিনয়ভূষণের ভূমিকাভিনেতা ভবেন্দু ভট্টাচার্য অত্যন্ত সংবেদনশীলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর চরিত্র। আলো জয় সেনের এবং রণজিৎ চক্রবর্তীর মঞ্চ এককথায় অনবদ্য।

শব্দরূপ - ৫৬৮

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

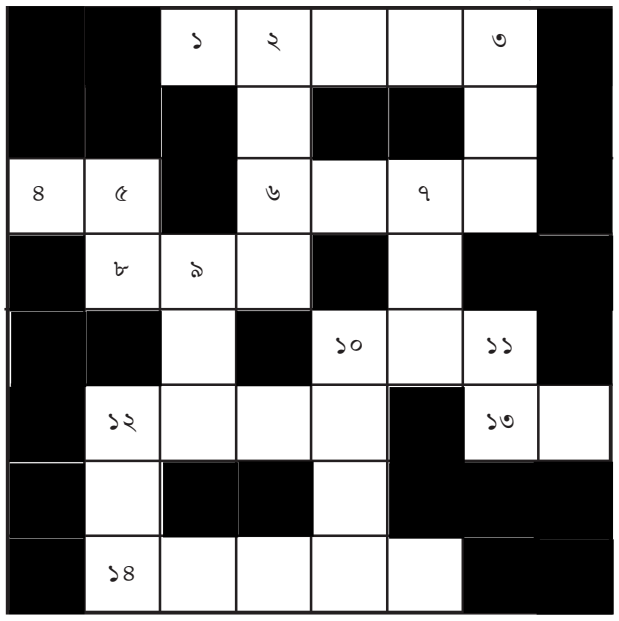

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. প্রতিশব্দে তেঁতুল, প্রথম দু’য়ে ধর্মরাজ, ৪. পতিপুত্রবতী, ৬. ‘জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য’—এই দার্শনিক মত, ৮. এক প্রকার তুলা, ১০. জানালা, ১২. অভ্যস্ত, মুখস্থ, ১৩. জমি ভোগ করবার অধিকারপত্র, ১৪. আচার্য জগদীশচন্দ্র এই গুল্ম নিয়ে তাঁর উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণা শুরু করেন।

উপর-নীচ ঃ ২. দুই অমাবস্যা যুক্ত, রবি-সংক্রান্তিবর্জিত মাস, অধিমাস, ৩. অভীষ্টপূরক, ৫. প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি, ৭. প্রশংসাসূচক উক্তি, শাবাস, ৯. অশ্বত্থ জাতীয় বৃক্ষবিশেষ, ১০. তামাক খাবার আলবোলা বিশেষ, ১১. রাত্রি, ১২. আরবীতে মদ, সুরা।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৬৬

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী

কলকাতা-৭০০০০৯

■	■	■	না	■	গো	ত	ম
■	ন	ভ	গ	■	পা	■	হি
শ	■	■	রা	খা	ল	■	ষ
কু	শ	ধব	জ	■	■	■	বা
নি	■	■	■	ন	ব	গ্র	হ
উ	■	কু	বে	র	■	■	ন
লু	■	টি	■	হ	রি	ত	■
ক	ম	লা	■	রি	■	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

● ৫৬৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০১১ সংখ্যায়

মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ছবি

‘শেষ কথা নয়’

মিতদ্রু দত্ত

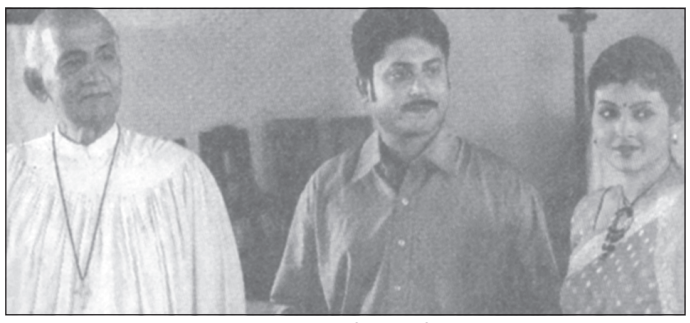

‘শেষ কথা নয়’ ছবির একটি দৃশ্য।

ভারতে এক অখ্যাত গ্রাম কুলডিহা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে পৌঁছায়নি বিদ্যুৎ। আজও নেই পাকা রাস্তা। চরম দারিদ্র্য ও নির্যাতন এই গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের চেনা ছবি। তথাকথিত পঞ্চায়েত থাকলেও তাতে শাসকদলের নেতা ও সমাজবিরোধীরা ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। এই অ-খ্যাত গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। সন্ত্রাসের বলি, অত্যাচারের শিকার হয়েও সেই হিন্দুরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করেনি। টাকার লোভ, বাড়ি পাকা করে দেওয়ার প্রলোভন সবই দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে। নীরবে, নিঃশব্দে, পাছে কেউ জানতে পারে! পাছে ‘খবর’ হয়ে যায়! শর্ত একটাই— তাদের সনাতন ধর্ম ও আদর্শকে ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হতে হবে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে এই গণ্ডগ্রামেও তৈরি করা হয়েছে গির্জা। খৃস্টানরাই সংখ্যাগুরু এখানে। হিন্দুরা তুলনায় অনেক কম। প্রতি রাতেই শাসক গোষ্ঠী এবং ওই বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকজন ও গুণ্ডারা চালায় নারকীয় সন্ত্রাস। মদত দেয় শাসক দলের পঞ্চায়েতও। গর্ভবতী মেয়েদের রেহাই দেওয়া হয়নি। সন্ত্রাসের ভয়ে পুরুষহীন এই গ্রামে প্রকাশ্যে খুন করা হয় অসহায়, নিরপরাধ হিন্দু গ্রামবাসীদের। ২ জন হিন্দু যখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন তখনই তাদের অপহরণ করে খুন করা হয়। এই হলো রোজা সোফেনার টেলিছবি— ‘নট দি লাস্ট ওয়ার্ড’। ছবিটি মূলত ইংরেজি ভাষায় হলেও বাংলায় ছবিটি রূপান্তরিত হয়েছে ‘শেষ কথা নয়’ নামে। ধর্মে ধর্মে বিরোধ নয়। চাই শান্তি-প্রগতি, ঐক্য ও সংহতি। শান্তি ও সমৃদ্ধিই সব ধর্মের মূল কথা। মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা। এ বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। শত অসহায় মুহূর্তেও সামান্য গ্রামবাসীরা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে লড়াই চালালেন তীব্রভাবে। জয়ীও হলেন। সত্য ও অহিংসার জয় হলো। অ-ধর্মের নামে খুন করা হয় মানবতা-কে। মুখে ভালবাসার কথা বললেও অনেকেই আসলে হিংসাকে নিজের অজান্তেই সমর্থন করে বসেন প্রতিদিন। ছবিটির বাংলা রূপান্তর করেছেন পার্থ রায়। জার্মান পরিচালক রোজা সোফেন কলকাতার কলেজক্যাম্পাস ও হস্টেলে র‍্যাগিং নিয়ে ছবি করেছেন এর আগে। সাড়াও পেয়েছেন ভালই। মানুষের একটিই ধর্ম সে মানুষ। তার ধর্ম যে মানবধর্ম। সে কথাই বার বার বলতে চাওয়া হয়েছে ছবিতে। হিন্দুত্বের অবমাননা ও মানবিক আদর্শ সমৃদ্ধ এ ছবিটির দেশে-বিদেশে প্রশংসা লাভ করেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ও স্বাধীনতার পক্ষে এ ছবি এক জোরালো ভাষা। সত্য ও অহিংসাই মানবতার মূল ভিত্তি সে বক্তব্যই রয়েছে ছবির

হিন্দুকেই হিন্দুত্ব রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে

বিশাখা বিশ্বাস

প্রথমে প্রথম শ্রেণীর কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যক্তিকে দিয়ে কুৎসাকর বিস্ফোরক কোনও মন্তব্য করাও। তারপর সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা দেখে নিয়ে সেই বক্তব্যকে প্রচারের মাত্রা দান করো কিম্বা সেই বক্তব্য সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিমত বলে বিতর্ক থেকে সরে যাও। লক্ষ্য এক ঃ হিন্দুত্বের কুৎসাকরণ।

ঘটনাটা কারোই অজানা নয়। ছাব্বিশ/এগারো তারিখের পাক-জঙ্গি কর্তৃক সেই মুম্বাই-হানা আজ ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের ডাষ্টবিন ঘেঁটে হিন্দুত্বের কুৎসা এবং অপহরণের কাজ থেমে নেই। অতি সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, কংগ্রেসী নেতা দিগবিজয় সিং বলেছেন, ছাব্বিশ/এগারোর বোম্বাইকাণ্ডে নিহত হেমন্ত কারকারে নাকি তার মৃত্যুর দিন কয়েক আগে তাকে বলেছিলেন যে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাকে বাঁচতে দেবে না। ভাগাড়ে পশ্বাদির শব আসামাত্র চারদিক থেকে যে গতিতে চিল শকুন উড়ে আসে, ভারতের সেকুলার হিন্দু-খৃস্টান-মুসলিম মিডিয়াগুলি সেই গতিতেই তৎক্ষণাৎ হিন্দুত্বের কুৎসাকর বক্তব্যকে লুফে নিল। এক্ষেত্রেও এদের উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত ঃ বিদেশী-বিধর্মী পাকমদতপ্রাপ্ত ইসলামিক জিহাদি জঙ্গিপনার সাথে ভারতবর্ষের কল্পিত হিন্দুজঙ্গিপনাকে একাসনে বসাও, তারপর চিরসহিষ্ণু হিন্দুত্ব থেকে তার সর্বকালের সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী ঔদার্যকে অপহরণ করে ভারতবর্ষে খৃস্টান এবং ইসলামী ধর্মপ্রসারণকে কায়েম করো।...

তরবারি কিংবা বন্দুকবাজি দ্বারা দেশজয় এবং বিজিত দেশে গেঁড়ে বসে শাসন এবং শোষণের দিন অপগত হয়ে গেছে। কিন্তু জিহাদ এবং ধর্মান্তরণ দ্বারা অনুন্নত দেশগুলিতে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ভারসাম্যকে বদলে দিয়ে সেই দেশকে নীরবে দখল করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।

সেই চক্রান্তের সফল রূপায়ণ ঘটেছে দেগঙ্গা-বেড়াচাঁপা অঞ্চলে। সদ্যসমাপ্ত দুর্গাপূজার প্রাককালে মুসলিম ঔদ্ধত্য ও মারমুখী জঙ্গি কার্যকলাপের প্রতিবাদে ওই অঞ্চলে বত্রিশটি পূজাকমিটি তাদের এতদ্‌কাল তক অনুসৃত শারদীয়া পূজা বন্ধ রাখতে বাধ্য হলো এবং সেই মর্মে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করলো। কিন্তু সমস্ত প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব ভুলে কেবল মমতা ব্যানার্জীর সাম্প্রতিক 'মুসলিম তোষণের' হুইসপারিং ক্যাম্পেন শুরু করলো, সেই সিপিএম যে নিজে ধর্মীয় সংরক্ষণকে পৌঁছে দিয়েছে মুসলিম সমাজের হাতে। অপরদিকে সম্প্রীতি রক্ষার বাণী বিলিয়েই দায়মুক্ত হলো কংগ্রেস এবং তৃণমূল। কোনও সংবাদপত্র অথবা দৃশ্যমাধ্যম সেই ঘটনার কতটুকু কিভাবে জনগণকে অবহিত করেছে তা জানা যায়নি।

ধর্মীয় জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তনের অপর প্রক্রিয়া হচ্ছে সাইলেন্ট ইনফিলট্রেশন এবং 'পিসফুল কনভারসন'। কলকাতার পাঠকেরা অনেকেই বিগত ২১ থেকে ২৪ অক্টোবরের খিদিরপুরে সেন্ট টমাস স্কুল চত্বরে এবং ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 'ফেস্টিভ্যাল অব লাইফ' নামক অনুষ্ঠানে খৃস্টানদের উদ্দাম নাচগানের আসর সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। কিন্তু পাঠকেরা যে বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত অল্প অবহিত রয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, এই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে তার অন্তরালে প্রায় লাখ চারেক হিন্দু এবং কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার মুসলিমকে খৃস্টানে কনভার্ট-এর চক্রান্ত করেছে। যে সমস্ত মিডিয়া হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার্থে বিজেপির সামান্য কথার খবরকেও 'খেউর' বানিয়ে পাঠকের পাতে পরিবেশন করে, পেট্রো-ডলারের ক্রীতদাস সেইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়াগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে এই খবরকে 'খুন' করতে না পারলেও তাকে তারা সাফল্যের সাথে 'গুম' করেছে। সাইলেন্ট এবং পীসফুল কনভারসনের এই রকম নজিরকে লক্ষ্য করেই এইসব সেকুলারদের কটাক্ষ করে প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের হাতে পড়ে সেকুলারিজিমের অর্থ এখানে হয়ে গেছে পারটিকুলার এনকারেজমেন্টস্ টু পারটিকুলার রিলিজিয়ন (বিশেষ বিশেষ ধর্মকে বিশেষ বিশেষ উৎসাহপ্রদান)।

বিশেষ বিশেষ ধর্মকে বিশেষ বিশেষ কনসেসন দেওয়ার ঘটনার কথা বিলিতি 'উইকিলিকস্' সম্প্রতি ফাঁস করে দিয়েছে। কিছুদিন আগে 'সীজারের পত্নীর মতো সততার প্রতীক' প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সীমান্ত পারের (বিধর্মী এবং বিজাতীয়) সন্ত্রাস ও মাওবাদী কর্মকাণ্ড ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিপদ'। কিন্তু মাওবাদী প্রসঙ্গে এই মন্তব্যে চীন চটে যেতে পারে বলে পরের দিনই তিনি আবার বললেন যে, মাওবাদীরা তো 'আমাদেরই ঘরের ছেলে'। 'উইকিলিকস্' প্রকাশ করেছে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত টিমোথি রোমর-কে রাহুল গান্ধী তখনই বলেছিলেন, লস্কর-ই-তৈবার চেয়েও অনেক বড় বিপদ হচ্ছে ভারতের ভেতরের হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি। 'উইকিলিকস্' আরও ফাঁস করেছে, গণতান্ত্রিক ভারতের 'রাজতান্ত্রিক যুবরাজ' রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, নিষিদ্ধ সিমি এ্যান্ড আর-এস-এস-এ্যাক্টিভিটিজ (সিমি এবং আর এস এসের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড) সমান। হায়! পাঞ্জাবে গান্ধীজীর জীবন রক্ষায় এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ও রক্ষায় আর এস এসের ত্যাগের জন্যে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সর্বাগ্রে আর এস এসকেই যে রাহুল গান্ধীর পিতামহীর পিতাজী অনুরোধ করেছিলেন, রাহুল গান্ধী তাই জানেন না— এ লজ্জা আমরা রাখবো কোথায়!

বিষয়টি (কারকারের স্ত্রী-র প্রতিবাদ) প্রকাশিত হওয়া মাত্রই বক্তব্যটি কেবল দিগ্বিজয় সিংয়ের ব্যক্তিগত অভিমত এবং এর সাথে কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই বলে পৌনপুনিকভাবে প্রচার করা হলো। ততক্ষণে বিশ্বে হিন্দুত্বের সম্ভ্রমহানি অনেকখানি হয়ে গেছে এবং কংগ্রেস কেবল বিতর্ক থেকে চতুরভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। ভারতবর্ষে এভাবেই প্রতিদিন কসাইখানা থেকে গাড়ী বোঝাই গরুর মাংস গরুতেই টেনে নিয়ে আসছে— হিন্দুরাই সেকুলারবাদের নামে প্রতিদিন হিন্দুত্বের কুৎসাকর্মটি সম্পাদন করে চলেছে।

কিন্তু প্রয়াত কারকারে সম্পর্কে দিগ্বিজয় সিংয়ের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়নি। হেমন্ত কারকারের বিধবা স্ত্রী অল্প পরেই দিগ্বিজয় সিংয়ের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং হিন্দু সমাজের চরিত্র হননের লক্ষ্যে পাকজঙ্গিদের এইভাবে শ্রীসিংয়ের আড়াল করার প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। বিষয়টি (কারকারের স্ত্রী-র প্রতিবাদ) প্রকাশিত হওয়া মাত্রই বক্তব্যটি কেবল দিগ্বিজয় সিংয়ের ব্যক্তিগত অভিমত এবং এর সাথে কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই বলে পৌনপুনিকভাবে প্রচার করা হলো। ততক্ষণে বিশ্বে হিন্দুত্বের সম্ভ্রমহানি অনেকখানি হয়ে গেছে এবং কংগ্রেস কেবল বিতর্ক থেকে চতুরভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে।

ভারতবর্ষে এভাবেই প্রতিদিন কসাইখানা থেকে গাড়ী বোঝাই গরুর মাংস গরুতেই টেনে নিয়ে আসছে— হিন্দুরাই সেকুলারবাদের নামে প্রতিদিন হিন্দুত্বের কুৎসাকর্মটি সম্পাদন করে চলেছে।

যদিও খৃস্টানী ধর্মান্তরণ সমগ্র গ্রীসকে গ্রাস করে ফেললেও, জিহাদী ইসলাম প্রাচীন ইরান-ইরাক-আফগান ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উদ্‌রীকরণ করে ফেললেও প্রায় হাজার বছরের ইসলামি 'স্যাকরেড সোর্ড' এবং খৃস্টানের বাইবেল আজও হিন্দুত্বের সম্পদটুকুকে একেবারে অপহরণ করতে পারেনি— কিন্তু সাপের মাথার মণির মতো মূল্যবান হিন্দুর জীবনের সেই হিন্দুত্বের সম্মুখে আজ বিপদ আরও ভয়ঙ্কর। তার শিয়রের একপাশে বাইবেল অন্যপাশে জিহাদী হানাদারি, পদপ্রান্তে একদিকে কিছু বিধর্মী বন্ধু অন্যদিকে বিভীষণের মতো স্বদেশী সেকুলার সমাজ— হিন্দুরাই হিন্দুত্বকে রক্ষার দায়িত্ব না নিলে তাকে রক্ষা করবে কে!

হিন্দু-বিরোধী রাজনীতিতে বিড়ম্বনা বাড়বে কংগ্রেসেরই

রাজা রায়

কংগ্রেস সভানেত্রী হিসেবে সোনিয়া গান্ধী হিন্দু বিরোধিতার যে পথ বেছে নিয়েছেন তা আখেরে দলের পক্ষে খুবই আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে। তিনি নিজে রোমান ক্যাথলিক। ছেলেমেয়েরা কোন ধর্ম অনুসরণ করে তা জানা যায়নি। তবে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য থেকে বুঝা যায়— তিনি জওহরলাল নেহরুর প্রকৃত উত্তরসূরি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো দেশপ্রেমিক সংগঠনকে যখন ভারতবিরোধী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস গোষ্ঠী সিমি এবং লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে তুলনা করেন তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না—তিনি কোন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একজন শিখ যখন দশ নম্বর জনপথ রোডের ক্রীড়নক মাত্র, সুপার প্রাইম মিনিস্টার তথা দেশের রাজনীতি এবং প্রশাসন যখন মা এবং ছেলের মর্জি মাফিক রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত—দেশবাসীর পক্ষে তখন উদ্বেগের কারণ ঘটেই থাকে।

ভারতবর্ষ যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে নাস্তানাবুদ, দেশের ধন-জন-সহায় সম্পদ সব কিছুর সামূহিক অপচয় ঘটছে, তখনও কিন্তু রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃত অভিপ্রায় জনগণের নিকট স্পষ্ট নয়। ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মাধ্যমে পাকিস্তান ভারত সরকারের গালে সজোরে চপেটাঘাত করেছে, দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাজাত্যাভিমান ধূল্যাবলুণ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু শাসক গোষ্ঠী ঘটনার ব্যাপকতা ও গুরুত্বের চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক লাভক্ষতির অঙ্ক নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানে মেরেছে, পাকিস্তানে মেরেছে— বলে শিশুর মতো ক্রন্দন করে আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের দৃষ্টি আকর্ষণের আকুল চেষ্টার মধ্যেই দেখা গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আব্দুর রহমান আনতুলে ঘটনার সঙ্গে পাকিস্তানের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তিনি বলেছেন, ২৬/১১-এ মুম্বাইর পুলিশ আধিকারিক হেমন্ত কারকারে পাকিস্তানী জঙ্গি নয়— অন্য কারো দ্বারা নিহত হয়ে থাকতে পারেন— অর্থাৎ উগ্রহিন্দু সংগঠনকেই এর জন্যে দায়ী করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাকিস্তানের দোষ লাঘব এবং এ দেশের পাকিস্তানপন্থীদের মন জয় করাই যে লক্ষ্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম আনতুলের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেও আনতুলেকে এ জন্যে ভর্ৎসনা করা তো দূরের কথা দু'দিন পর দলের পক্ষ থেকে আনতুলের অভিমতের সমর্থন জানানো হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না কার ইঙ্গিতে আনতুলেরা এত শক্তিমান।

গত মাসে এআইসিসি-র অধিবেশনে প্রণব মুখোপাধ্যায় দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক প্রস্তাবে মাওবাদ এবং হিন্দু উগ্রবাদের উল্লেখ করেছেন— আর কংগ্রেস সভানেত্রী তো তার ভাষণে হিন্দু সন্ত্রাসকেই মূল সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ইসলামিক সন্ত্রাস বা পার্বত্য উপজাতির মধ্যে খৃস্টান মিশনারী কর্তৃক বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

ভারতের সংসদ আক্রমণের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আফজল গুরুর শাস্তির আবেদন কার্যকর করা বছরের পর বছর ঝুলে থাকা, আমেদাবাদের কুখ্যাত দুর্বৃত্ত সোহরাবুদ্দিন হত্যাকাণ্ড নিয়ে— রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা থেকেই বুঝা যায় সোনিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসীদের প্রকৃত অভিপ্রায় কী। যে কাশ্মীর নিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই অপরিমেয় ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করে আসতে হচ্ছে, আজ কংগ্রেসের কোয়ালিশন শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লার মুখে শুনতে হয়— 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়।' বিরোধীরা এর প্রতিবাদ করলে কংগ্রেসের মুখপাত্ররা জানান— 'ওমর আব্দুল্লা ভুল বলেননি।'

কংগ্রেসের মহাসচিব দিগ্বিজয় সিং সম্প্রতি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে, অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ২৬ নভেম্বর মুম্বাই হামলার দিন নিহত মহারাষ্ট্রের এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারের হত্যার দায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কাঁধে চাপাতে চেয়েছেন। হেমন্ত নাকি মৃত্যুর দু'ঘণ্টা আগে দিগ্বিজয়কে ফোনে জানিয়েছিলেন যে হিন্দুত্ববাদীরা তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। খুবই আজব ঘটনা! ঘটনার দু'বছর পর বিষয়টি তার মনে পড়ল।

হেমন্তের স্ত্রী কবিতা কারকারে সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ ধরনের কিছু হয়ে থাকলে হেমন্ত মধ্যপ্রদেশের দিগ্বিজয়কে জানাবার আগে অবশ্যই তাঁকে জানাতেন। কারকারের পরিবার এটা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন— পাকিস্তানী জঙ্গিরাই তাকে হত্যা করেছে। তার স্বামীর মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি না করার জন্যে কবিতা দিগ্বিজয়কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

বিরোধীরা দিগ্বিজয়কে পাকিস্তানের এজেন্ট এবং বিদেশী স্বার্থের রক্ষক হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর পেছনে অন্য অভিসন্ধিও থাকতে পারে। দিগ্বিজয়-এর এই বিবৃতি প্রকাশের ঠিক আগেই অসমে কংগ্রেসের দায়িত্ব পেয়েছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাকে বরুণ গান্ধীর মোকাবিলা করতে হবে এবং অসমের মুসলিম ভোটদাতারা নানা কারণে কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ।

এ ছাড়া 'এ আই ইউ ডি এফ' চ্যালেঞ্জ তো রয়েছেই। তাই জেনেশুনেই হিন্দু বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছেন।

গুমোর অবশ্য ফাঁস করে দিয়েছে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উইকিলিকসও। উইকিলিকস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের যে লক্ষাধিক নথি প্রকাশ করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে— ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মালফোর্ডের একটি বার্তা। ২৬/১১ কাণ্ডের পর ২৩ ডিসেম্বর মালফোর্ড ওয়াশিংটন ডিসিতে যে বার্তাটি প্রেরণ করেন তাতে তিনি লিখেছেন— 'আন্তুলের বক্তব্যকে চিদম্বরম খারিজ করলেও দু'দিন পর কংগ্রেস অন্য একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, দেশবাসীর কাছে অলীক মনে হলেও আন্তুলের দাবিকেই সমর্থন জানায়। এর ফলে ভারতের মুসলিম সমাজের বাহবা ও সমর্থন অর্জনের আশা করছে কংগ্রেস। মালফোর্ড আরও লিখেছেন— 'মনে হচ্ছে আগামী নির্বাচনগুলোতে মুসলিম ভোটারদের কংগ্রেসের দিকে আকর্ষিত করতে অবিশ্বাস্য হলেও কারকারের মৃত্যুর পেছনে হিন্দু জঙ্গিদের হাত থাকার গল্প তারা বলেই যাবে।'

ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি মাথায় রেখে কংগ্রেসীরা যতই কারসাজি করুক না কেন— সব চক্রান্তই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যে ব্যুমেরাং হতে পারে।

Swastika
17 January - 2011, Rs. 4.00 only
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
RNI No.5257/57 License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

রাষ্ট্রীয় শিখর প্রতিভা সম্মানে সংবর্ধিত বিড়লা দম্পতি

বাসুদেব পাল।। "জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। উল্টোদিকে মানুষের জীবনের, মূল্যবোধের দাম কমছে। মানুষের জীবনের কোনও দাম নেই। মূল্যবোধও দিন দিন নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। স্বাধীনতার ৬২ বছর বাদেও বিশালসংখ্যক মানুষ ফুটপাতে বসবাস ও জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন স্লোগান দিয়েছিলেন— দেশ থেকে গরীবী দূর (গরীবী হটাও) করবেন। দেশের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলিকে দূর করতে হলে আমাদের চিরায়ত ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতকে গড়ে তুলতে হবে। এই নির্মাণ পরম্পরায় বিড়লাদের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সবক্ষেত্রে অবদান অপরিসীম।"

এভাবেই প্রধান অতিথির ভাষণে নিজের বক্তব্যকে মহাজাতি সদনের হলভর্তি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন। গত ৯ জানুয়ারী বহুল পরিচিত বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় দেশ ও সমাজের সেবায়

বিড়লা দম্পতিকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

নিবেদিতপ্রাণ বসন্তকুমার বিড়লা এবং ডঃ সরলা বিড়লাকে 'রাষ্ট্রীয় শিখর প্রতিভা' সম্মানে-এ সম্মানিত করেন। একই সঙ্গে কলকাতার বহু সামাজিক ও সেবাব্রতী সংস্থাও বিড়লা দম্পতিকে পুষ্পস্তবক ও মালা দিয়ে সম্বর্ধনা জানান। সত্যনারায়ণ তেওয়ারির ভজন গান তথা মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বিড়লা দম্পতির সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন বিষয়ে বিস্তৃতভাবে শ্রোতাদের অবহিত করেন বিড়লা পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকা কৃষ্ণস্বরূপ দীক্ষিত। তিনি অবশ্য বলেন, যতটাই বলি না কেন তা কম হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বৃন্দাবন থেকে আগত স্বামী গিরিশানন্দ মহারাজ। বিড়লা দম্পতির সরল অনাড়ম্বর সেবাপরায়ণ জীবনকে রাজ-ঋষি বলে তাঁর ভাষণে অভিহিত করেন। ডঃ সরলা বিড়লা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁদের প্রতি সর্বসাধারণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেন।

বসন্তকুমার বিড়লাকে মালা দিয়ে বরণ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পুস্তকালয়ের প্রাক্তন সভাপতি যুগলকিশোর জৈথলিয়া। বিড়লা দম্পতিকে শাল ও শ্রীফল তুলে দেন বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন। মানপত্র প্রদান করেন স্বামী গিরিশানন্দ মহারাজ। সভা পরিচালনা করেন ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী এবং শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহাবীর বাজাজ। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম শীর্ষস্থ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে সম্মান জ্ঞাপনের এই অনুষ্ঠান— একই সঙ্গে মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য।

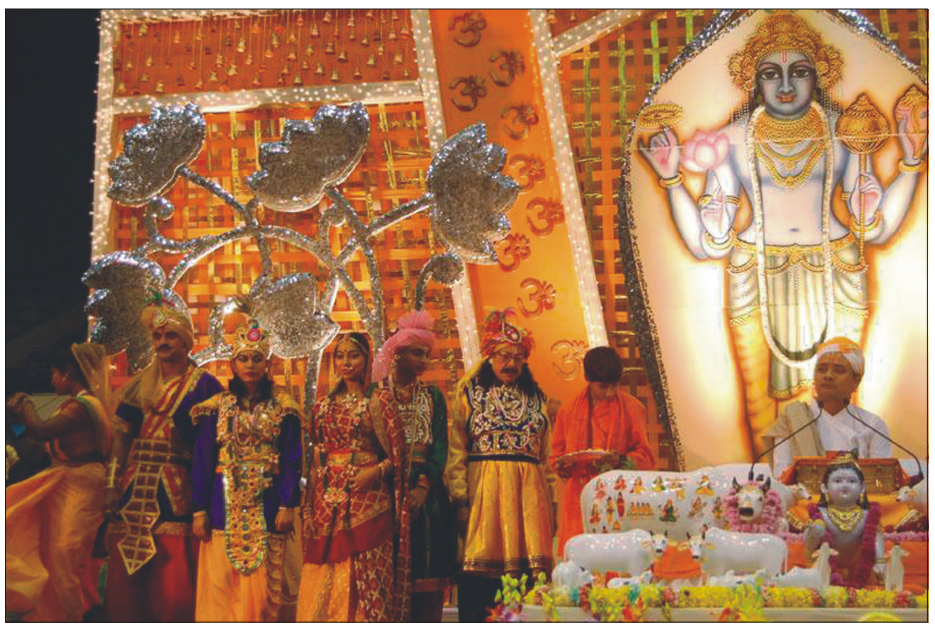
প্রবচনরত রাধাকৃষ্ণ মহারাজ। রাধাকৃষ্ণের সাজে অন্যরা।

কলকাতায় ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির উদ্যোগে

বাসুদেব পাল।। সেই কবে বৈষ্ণব কবি লিখেছিলেন, "রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়"। একথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে— সমবেত হাজার হাজার ভাগবত কথা পিপাসু ভক্ত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে কথাকার অবগত করিয়ে দিলেন, "গোপিনীদের 'কৃষ্ণপ্রেম' নিষ্কাম অপার্থিব অনাবিল অনন্ত অলৌকিক। কেননা, যারা স্বয়ং কৃষ্ণের অংশবিশেষ, স্বয়ং গোকুলবিহারী বৃন্দাবন লীলাকার শ্যাম যাদের কাছে ধরা দিয়েছেন, সেখানে হাড়-মাংস, মল-মূত্রের পার্থিব বস্তুকে পরমতত্ত্বকে বাদ দিয়ে গ্রহণের কোনও কারণই নেই। কৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করেননি, তিনি গোপিনীদের 'অজ্ঞানতাকে' অপহরণ করেছিলেন।"

এভাবেই ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবচন ও গানের মাধ্যমে ভক্তিভাব জাগরণের কাজ করছেন 'বালব্যাস' উপাধিতে ভূষিত যোধপুর থেকে আগত শ্রীরাধাকৃষ্ণজী মহারাজ। বয়সে নবীন অথচ প্রবচনে প্রবীণ। বিশাল মঞ্চে নবীন এই কথাকারকে যেমন দেখাচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি বড় করে দেখা যাচ্ছিল নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের স্থানে স্থানে রাখা টিভির পর্দায়।

প্রতিবছরের মতো এবারও সাতদিন ব্যাপী (৫-১১) জানুয়ারী মাসে এই ভাগবত পাঠের আয়োজন করেছেন বনবাসী এলাকায় শিক্ষা সংস্কার এবং আধ্যাত্মিক প্রবচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একতা জাগরণ কাজে সদা তৎপর শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি। হাজার হাজার মানুষকে শ্রীহরিকথা (ভাগবত কথা)-র মাধ্যমে সেই দুপুর দুটো থেকে আটকে রেখেছেন কথাকার। নির্দ্ধারিত সময়ের পরেও সকলে আরও শুনতে চান। চাইছেন নিষ্কাম কৃষ্ণপ্রেমের ভক্তিসাগরে অবগাহন করতে। কেবল সাতদিনই নয়, দিবারাত্র শয়নে স্বপনে জাগরণে মননে প্রাণপ্রিয় কানাইকেই অনুধ্যান করতে হবে। তাহলে তিনি আজও সশরীরে দেখা দিতে পারেন। সর্বস্ব সমর্পণ ছাড়া তা অসম্ভব। কেবলমাত্র ভক্তিতেই সম্ভব।

সোঁপ দিয়ে মনপ্রাণ তুম্হী কো।
সোঁপ দিয়ে মমতা অভিমান।।

চোখ দিয়ে দেখা যায়, কথা বলা যায় না, মুখ দিয়ে বলা যায়, দেখা যায় না। দর্শন হলে আর বলার অবস্থা থাকে না। পাঠের শেষে সৎসঙ্গের কর্মকর্তারা কোমরে ঝুলি বেঁধে আঁচল পেতে ভক্তদের দান সংগ্রহ করলেন সেবাকাজের জন্য। এক অদ্ভুত দৃশ্য। যেন গোকুলধামই উঠে এসেছে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম চত্বরে। কথা শুনে নামগানে মাতোয়ারা প্রায় সকলেই গাইছেন, নাচছেন অথবা দুলছেন— শরীর স্থির নেই। আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এই বিরল দৃশ্য দেখা গেল। আয়োজক শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি সত্যিকারের 'সৎসঙ্গ' উপহার দিলেন কলকাতাবাসীকে। এখানেই অন্যদের সঙ্গে ফারাকটা নজরে পড়ে। সবাই যেন, সমিতির কাজে 'সোঁপ দিয়ে মন-প্রাণ।' সেখানেই সার্থকতা এই বিশাল আয়োজনের।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com